নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [বৈশাখ, ১৩২৯।

মহাত্মাজী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সম্বাদ যে কি সে কেবল ভারতবাসীই জানে! তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকোন্মত্ত নর-নারী পথে-পথে বাহির হইয়া পড়িল না, লক্ষ-কোটী সভা সমিতিতে হৃদয়ের গভীর ব্যথা নিবেদন করিতে কেহ আসিল না —যেন কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই,—যেমন কাল ছিল আজও সমস্তই ঠিক তেম্‌নি আছে, কোনখানে একটি তিল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয় নাই—এম্‌নি ভাবে আসমুদ্র হিমাচল নীরব হইয়া আছে। কিন্তু এমন কেন ঘটিল? এতবড় অসম্ভব কাণ্ড কি করিয়া সম্ভবপর হইল? নীচাশয় এ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনের মত সে মিথ্যা খণ্ডন করিতে কেহ উদ্যত হইল না। আজ কথা কাটা-কাটি করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত কাহারও নাই! মনে হয় যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অতীত।

যাইবার পূর্ব্বাহ্ণে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন, তাঁহার জন্য কোথাও কোন হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ-সভা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে। এই কণ্ঠরোধ, এই নিঃশব্দ সংযম, আপনাকে দমন করিয়া রাখার এই কঠোর পরীক্ষা যে কতবড় দুঃসাধ্য

এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবুও এ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যাইতে তাঁহার বাধে নাই। আর একদিন যেদিন তিনি বিপন্ন দরিদ্র উপদ্রুত ও বঞ্চিত প্রজার পরম দুঃখ রাজার গোচর করিতে যুবরাজের অভ্যর্থনা নিষেধ করিয়াছিলেন, এই অর্থহীন, নিরানন্দ উৎসবের অভিনয় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত হইতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন সে দিনও তাঁহার বাধে নাই। রাজরোষাগ্নি যে কোথায় এবং কত দূরে উৎক্ষিপ্ত হইবে ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু কোন আশঙ্কা কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা কত বজ্রপাত কত দুঃখই না বহিয়া গেল, কিন্তু, একবার যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যুবরাজের উৎসব সম্বন্ধে শেষ দিন পর্য্যন্ত সে আদেশ তাঁহার প্রত্যাহার করেন নাই। তার পর অকস্মাৎ একদিন চৌরি চৌরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন এ কথা সমস্ত জগতের কাছে অকপট ও মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হইল না। নিজের ভুল ও ত্রুটি বারম্বার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও সুতীব্র সংঘর্ষের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত হইতে সমস্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল বিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয়-কংগ্রেস-কার্য্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন I have lost all fear of men জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এ দেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন, তাহার দণ্ডভোগ ও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয় হীনতার পরীক্ষা তাঁহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল,—অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড—এ কথা লোকে এক প্রকার ভুলিয়াই ছিল—যাবার পূর্ব্বে দেশের কাছে এই

পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল, অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া যাইতে হইল যে সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, যশঃ এমন কি জন্মভূমির উপরেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা পারা যায় না। কিন্তু এতবড় শান্তশক্তি ও সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা ধর্ম্মহীন উদ্ধত রাজশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিল। মহাত্মাকে সেদিন রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুকাল হইতে এই সম্ভাবনা জনশ্রুতিতে ভাসিতেছিল, অতএব, ইহা আকস্মিকও নয়, আশ্চর্য্যও নয়। কারাদণ্ড অনিবার্য্য। ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। ভাবনা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিজের জন্য নয়, এ চিন্তা সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত দেশের জন্য। যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহারা কোথাও কোন কিছু নাই, আর্ত্তের জন্য পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল। দেশের মঙ্গলেই রাজশ্রীর মঙ্গল, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ শাসন তন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এ দেশে সত্য কি না, এখানে দেশের হিতার্থেই রাজ্য পরিচালনা, প্রজার ভাল হইলেই রাজার ভাল হয় কি না, ইহা চোখ মেলিয়া আজ দেখিতে হইবে। আত্ম বঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিষ্ফল অগ্নিকাণ্ড করিয়া নয়,—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়,—কারাবরোধের অধিকার অর্জ্জন করিয়া।

হয় ত ভালই হইয়াছে শাসন যন্ত্রের নাগপাশে আজ তিনি আবদ্ধ। তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু দেশের ভার যখন আজ দেশের মাথায় পড়িল,—একটা কথা যে তিনি বার বার বলিয়া গিয়াছেন, দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিতে হয় —তাঁহার অবর্ত্তমানে আপনাকে সার্থক করিবার এই পরম সুযোগটাই হয় ত আজ সর্ব্ব সাধারণের ভাগ্যে জুটিয়াছে। যাহারা রহিল তাহারা নিতান্তই মানুষ, কিন্তু মনে হয় অসামান্যতার পরম গৌরব আজ কেবল তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

আরও একটা পরম সত্য তিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া গেছেন। কোন

দেশ যখন স্বাধীন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেশাত্মবোধের সমস্যা ও খুব জটিল হয় না, স্বদেশ প্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। সে দেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলে ও হয় ত চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে তখন ঐ ঢিলাঢালা কর্ত্তব্যের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দ্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতার অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয় কাজে, চালাকির মারপ্যাঁচে নয়, সরল সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়, সকল চিন্তা সকল উদ্বেগ সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিয়া। ইহা অন্যথা বিশ্বাস করা চলে না। এই পরম সত্যটিকে আর আমাদের বিস্মৃত হইলে কোন মতে চলিবে না। এই পরীক্ষা দিতে গিয়াই আজ শত সহস্র ভারতবাসী রাজ কারাগারে। এবং এই জন্যই ইহাকে স্বরাজ আশ্রম নাম দিয়া ও তাঁহারা আনন্দে রাজদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন।

প্রজার কল্যাণের সহিত রাজশক্তির আজ কঠিন বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিগ্রহ এই বোঝাপড়া কবে শেষ হইবে সে শুধু জগদীশ্বরই জানেন, কিন্তু রাজায় প্রজায় এই সংঘর্ষ প্রজ্বলিত করিবার যিনি সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত আজ যদিও তিনি অবরুদ্ধ, কিন্তু, এই বিরোধের মূল তথ্যটা আবার একবার নূতন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসই সকল সদ্ভাব, সকল বন্ধন, সকল কল্যাণ পলে পলে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্র কহিলেন এই, প্রজাপুঞ্জ জবাব দিতেছে,না এই নয় তোমার মিথ্যা কথা; রাজশক্তি কহিতেছেন, তোমাকে এই দিব এতদিনে দিব, প্রজাশক্তি চোখ তুলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে কোন দিন কিছু দিবে না,—নিছক বঞ্চনা করিতেছ।

"কে বলিল?"

"কে বলিল! আমার সমস্ত অস্থি মজ্জা, আমার সমস্ত প্রাণশক্তি আমার আত্মা, আমার ধর্ম্ম, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পেটের সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি গুলা পর্য্যন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেবল এই কথাই ক্রমাগত বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শোনে কে? চিরদিন তুমি শুনিবার ভাণ করিয়াছ কিন্তু শোন নাই। আজও সেই পুরোনো অভিনয় আর একবার নূতন করিয়া করিতেছ মাত্র। তোমাকে শুনাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জগতের কাছে আমার লজ্জা ও হীনতার অবধি নাই কিন্তু আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তোমার কাছে

নালিশ করিব না, শুধু আর একবার আমার বেদনার কাহিনীটা দেশের কাছে একে একে ব্যক্ত করিব।"

ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব সেবার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন এই বাঙলা দেশেরই একজন বিশ্ব বিখ্যাত বাঙ্গালী তাঁহাকে একখানা বড় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহার মস্ত একটা জবাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আগা গোড়া ভাল ভাল ফাঁকা কথার বোঝায় ভরা চিঠিখানির ফাঁকিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই, এবং বোধ করি মনেও থাকে না। কিন্তু এপক্ষের মোট বক্তব্যটা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইনি বার বার করিয়া, এবং বিশদ করিয়া ওই বিশ্বাস অবিশ্বাসের তর্কটাই চার পাতা চিঠি ভরিয়া সাহেবকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। যেন এত বড় নূতন তত্ত্ব কথা এই ভারতভূমি ছাড়া বিদেশী সাহেবের আর কোথাও শুনিবার সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ আমার বিশ্বাস সাহেবের বয়স অল্প হলেও এ তত্ত্ব তিনি সেই প্রথমও শুনেন নাই এবং সেই প্রথমও জানিয়া জান নাই। কিন্তু জানা এক এবং তাহাকে মানা আর। তাই সাহেবকে কেবল এমন সকল কথা এবং ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল যাহা দিয়া চিঠির পাতা ভরে কিন্তু অর্থ হয় না।

কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিকই সত্য? জগতে কোথাও কি ইহার ব্যতিক্রম নাই। গভরমেণ্ট আমাদের অর্থ দিয়া বিশ্বাস করেন না, পল্টন দিয়া বিশ্বাস করেন না, পুলিশ দিয়া বিশ্বাস করেন না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু শুধু কেবল এই জন্যই কি আমরাও বিশ্বাস করিব না এবং এই যুক্তিবলেই দেশের সর্ব্বপ্রকার রাজ-কার্য্যের সহিত অসহযোগ করিয়া বসিয়া থাকিব? গভরমেণ্ট ইহার কি কি কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন জানি না, খুব সম্ভব কিছুই দেন না, দিলেও হয়ত ওই মণ্টেগু সাহেবের মতই দেন যাহার মধ্যে বিস্তর ভাল কথা থাকে কিন্তু মানে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের অফিসিয়াল বুলি ছাড়িয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন, তোমাদের এই সকল দিয়া বিশ্বাস করি না খুব সত্য কথা, কিন্তু সে শুধু তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।

আমরা রাগ করিয়া জবাব দিই, ও আবার কি কথা? বিশ্বাস কি কখনও একতরফা হয়? তোমরা বিশ্বাস না করিলে আমরাই বা করিব কি করিয়া?

অপর পক্ষ হইতে যদি পাল্টা জবাব আসিত, ও বস্তুটা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে একতরফা হওয়া অসম্ভবও নয় অস্বাভাবিকও নয়। তাহা হইলে কেবলমাত্র

গলার জোরেই জয়ী হওয়া যাইত না। এবং প্রতিপক্ষ সাধারণ একটা উদাহরণের মত যদি কহিতেন, পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি যখন অস্ত্র চিকিৎসায় চোখ বুজিয়া ডাক্তারের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে তখন বিশ্বাস বস্তুটা একতরফাই থাকে। পীড়িতের বিশ্বাসের অনুরূপ জামিন ডাক্তারের কাছে কেহ দাবী করে না এবং করিলেও মেলে না। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, তাঁহার সাধু ও সদিচ্ছাই একমাত্র জামিন এবং সে তাঁহার নিছক নিজেরই হাতে। পরকে তাহা দেওয়া যায় না। রোগীকে বিশ্বাস করিতে হয় আপনারই কল্যাণে, আপনারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য।

এ পক্ষ হইতেও প্রত্যুত্তর হইতে পারে, ওটা উদাহরণেই চলে বাস্তবে চলে না। কারণ অসঙ্কোচে আত্ম-সমর্পন করিবারও জামিন আছে কিন্তু তাহা ঢের বড়, এবং তাহা গ্রহণ করেন চিকিৎসকের হৃদয়ে বসিয়া ভগবান নিজে। তাঁর আদায়ের দিন যখন আসে তখন না চলে ফাঁকি না চলে তর্ক। তাই বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজ-শক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারা-মারি কাটা-কাটি, অস্ত্র-শস্ত্র বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবের সকল সুখ দুঃখ,সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্মের আধার তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আজ স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন যত আচ্ছন্নই না হইয়া থাক একদিন ইহাকে নির্ম্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্ত্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতেই এই ধর্ম্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতা-কলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা-বন্দুক-বারুদ কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে এই পর সত্যকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা ব্রতকে মাত্র ক্ষণেকের উপায় বলিয়া নয়, চির জীবনের একমাত্র

ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এই জন্যই তিনি ভারতীয় আন্দোলনকে রাজনীতিক না বলিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় দিনের পর দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিপক্ষ উপহাস করিয়াছে, স্বপক্ষ অবিশ্বাস করিয়াছে কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন কিন্তু মানুষ ইংরাজদের কোনদিন কোনদিন আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে!

কিন্তু এই অচঞ্চল নিষ্কম্প শিখাটির মহিমা বুঝিয়া উঠা অনেকের দ্বারাই দুঃসাধ্য। তাই সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু যখন মহাত্মাজীর কথা—"I would decline to gain India's Freedom at the cost of non violence, meaning ,that India will never gain her Freedom without non —violence" তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে 'মহাত্মাজীর লক্ষ্য—সত্যাগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ এই লক্ষ্যের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মূল লক্ষ্য নহে" তখন তিনিও এই শিখার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অপরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কত বড় সত্যবস্তু এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আগ্রহ ও যে কত বড় স্বরাজসাধনা তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই, সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ। এবং এই চাওয়ার মধ্যেই মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার এবং সর্ব্বোত্তম লক্ষের পরিণতি রহিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তের কৃপণের দেয় অর্থ নয়, তাহার দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের স্বার্থকতার দান। অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তিনি আজও সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন মানবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা বা স্বরাজকামী যখন তিনি ইংরাজ রাজত্বে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন

তখন তাঁহাকে বিস্তর কটুকথা শুনিতে হইয়াছিল। বহু কটূক্তির মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে ইংরাজ রাজত্বের সহিত আমাদের চির দিনের অবিচ্ছিন্নবন্ধন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। নিরুপদ্রব শান্তির জনাই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন? পরাধীনতা যখন পাপ এবং পরের স্বাধীনতা অপহরণকারীও যখন এত বড় পাপী তখন যেমন করিয়া হৌক ইহা হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম। ইংরাজ নিরুপদ্রব পথে রাজ্য স্থাপন করে নাই, এবং রক্ত পাতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু নিরুপদ্রবপন্থী থাকিতে হইবে এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করি কিসের জন্য? কিন্তু মহাত্মাজী কর্ণপাত করেন নাই, তিনি জানিতেন এ যুক্তি সত্য নয়, ইহার মধ্যে একটা মস্ত বড় ভুল প্রচ্ছন্ন লইয়া আছে। বস্তুতঃ, এ কথা কিছুতেই সত্য নয় জগতে যাহা কিছু অন্যায়ের পথে অধর্ম্মের পথে একদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে আজ তাহাকে ধ্বংস করাই ন্যায় যেমন করিয়া হোক তাহাকে বিদূরিত করাই আজ ধর্ম্ম! যে ইংরাজ রাজ্যকে একদিন প্রতিহত করাই ছিল দেশের সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম! সেদিন তাহাকে ঠেকাইতে পারি নাই বলিয়া আজ যে-কোন-পথে তাহাকে বিনাশ করাই দেশের একমাত্র শ্রেয়ঃ এ কথা কোন মতেই জোর করিয়া বলা চলে না। অবাঞ্ছিত জারজ সন্তান অধর্ম্মের পথেই জন্ম লাভ করে অতএব ইহাকে বধ করিয়াই ধর্ম্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায় তাহা সত্য নয়।

বন্দী বীর

[শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত]

(দ্বীপান্তরিত দেশ-নেতা)

সময়—প্রভাত।

ওরে বন্দী করিল কে!
গর্ব্বী আমার মত্ত পরাণে বন্ধন দিল রে!
বন্ধ করেছে লৌহকারায়—তারি পাশে দৃঢ় ভীম
প্রাচীর-পরিখা ঘেরিয়া দাঁড়ায়—প্রাণ করে ঝিম্‌ঝিম্,
আকাশ নেহারি নীল-অর্ণব নির্ব্বাক দয়াহীন
প্রভাত-অরুণ-করুণ ছটায় তেমনি ত দিশি লীন।

ঐ শোনা যায় সিন্ধু গর্জ্জে আছড়ি পড়িছে জল
লৌহকারায় কম্পন লাগে, প্রাণ করে টলমল,
ভাঙি দিব আজ লৌহকারায় চূর্ণি পরিখা বেড়
সিন্ধুর কল কল্লোল পাশে দাঁড়াইয়ে উদ্বেল
উত্তাল চল চঞ্চল ক্ষ্যাপা প্রবল করিব প্রাণ,
উচ্চ ঊর্ম্মি দলিয়া চরণে করে যাব অভিযান
স্বদেশে আমার স্বর্গে আমার—দৃঢ়তর বলীয়ান
দৃঢ়তর বীর কর্ম্ম অটল; করে' লব গরীয়ান
অবনত ম্লান দীন দেশভূমি, শক্তমুষ্টি-বল
শত্রুর মাথে পরখ্ করিব; অন্যায় কলা-ছল
চূর্ণিয়া দেশ করিব মুক্ত ভাস্বর দিবা প্রায়,
আয় রে সিন্ধু-কলকল্লোল আয় আয় বুকে আয়।

সময়—মধ্যাহ্ন।

দুপুরে সূর্য্য বিকট বীর্য্য ছড়ায় সকল দিক
সিন্ধুগর্জ্জে ভীম ভীমতর দাপটি ঝাপটি;—ধিক!
ধিক্ ধিক্ মোরে আলস-বিলাসী কাজহীন অক্ষম
নিশ্চল বসি নির্জ্জীব হেথা, হোথা পাপ নিরমম
শত্রু সাধিছে, আর্ত্ত কাঁদিছে কে মুছাবে আঁখি-জল
কে বলিবে—"ভাই, কোন ভয় নাই, নহি নহি দুর্ব্বল,
এই আমি আছি চলে এস কাজী বর্ম্ম কৃপাণ কই
দুর্জ্জয় জয় বাসনা বক্ষে দীন নহি, ক্ষীণ নই।"
কল্প নয়নে দেখি—অন্যায়ী তুলি উদ্ধত হাত
নির্ব্বাক দেশসেবীর মাথায় করিছে অস্ত্রাঘাত,
ভূমে ঝরে পড়ে লক্ষ ধারায় জীবের শোণিত স্রোত—
সে স্রোতের টীকা ললাটে পরিয়ে দৃপ্ত দুর্নিরোধ
কে যেন জাগিল গর্জ্জি জাগাল লক্ষ ত্রস্ত প্রাণ,
মৃত্যে মাতিয়া মৃত্যু বরিছে, কাটি করে খান খান
অত্যাচারীর দম্ভ পূরিত গর্ব্বিত শত শির,
নির্দ্দোষ শত ভ্রাতারে বাঁচায়, বীর বটে সে যে বীর।

ঐ ঐ পথে চলে যে দুখিনী ক্ষীণ শিশু বুকে লয়
শত্রুর গোলা তাহারে গ্রাসিতে ছুটে আসে দুর্জ্জয়—
এই এই আমি, আমি লব গোলা বক্ষ পাতিয়া আজ
ও দীনা নারীরে রক্ষা করিতে হাসিয়া বরিব বীজ।
যাই যাই!—একি চরণে টানে যে লৌহের শৃঙ্খল,
কারার দুয়ারে হাত নাহি যায়, একি জঞ্জাল বল্!
ছিঁড়িব বলয় মুক্ত চরণে দুয়ারে করিব ঘাত
সাতারি' সিন্ধু ভেদিয়া চলিব নিমেষে হতে না রাত,
বীরের মতন ছুটিয়া যাইব আর্ত্ত-ভ্রাতারি মাঝ,
দেখিয়া সঘনে গাবে উল্লাস, বলিবে যে—"সাজ সাজ।"
আমি ফুকারিয়া আকাশ ফাঁড়িয়া বলিবরে—"জয় জয়,
জয় জয় জয়ী হে দেশতনয়, জন্মভূমির জয়।"
শীত কুঞ্চিত বৃক্ষপত্র প্রভাতে তুলে সে শির—
তেমনি গর্ব্বে উঠিবে জাগিয়া ম্লান অনুচর বীর;
মৃত্যু দলিয়া নৃত্য করিব—শত্রুর অবসান;
নাহিক গোপন,—অরুণ-কিরণ সমান দীপ্তিমান
আধার বিতাড়ি' নির্ম্মল পূত করিব জননী দেশ,
না রবে ভ্রূকুটি পীড়নের নীতি, নাহি নাহি রবে ক্লেশ।
প্রখর রৌদ্র পড়িয়াছে ঐ কারার প্রাচীর গায়
তাহারি ওপাশে সিন্ধু উছসে, বলে যেন—আয় আয়,
যাই যাই আমি গর্জ্জন ডাকে, নর্ত্তন দেয় দোল,
হে পিতা সিন্ধু, রুদ্র দীক্ষা দাও দাও মোরে কোল,
পিতার সমান লালিয়া পালিয়া দাও মোরে বল দাও,
ঊর্ম্মি বাহুতে লুফিয়া লুফিয়া লয়ে যাও লয়ে যাও,
দুর্দ্দম দাও শক্তি প্রচুর উদ্দাম-গতিমান,
তুমি যে সিন্ধু মুক্ত ধরণীর জাগ্রত চল প্রাণ।
অসহ রৌদ্র, তাহাতে রুদ্র সিন্ধুর গরজন,
আমি যে বন্ধ!—দুঃসহ ক্লেশ! ভাঙ ভাঙ বন্ধন।
সূর্য্য প্রখর তূর্য্য বাজাও হে জীবন-সুধা-রস,
সিন্ধু মহান মাতাল-পরাণ, কর মোরে নিরলস।

সময়—সন্ধ্যা।

দিবা শেষ হয় আজি হল ছয় দিবস হেথায় আমি—
রুদ্ধ পরাণ বক্ষ-খাঁচায় আছড়িছে দিবা যামি;
এই যে আজি কে কারার উপরে একটি দিবস মরে
কর্ম্মবিহীন অলস নীরব,—কে জানে রে দেশ-ঘরে
এই দিবসের প্রতি নিমেষেই উঠেছে আর্ত্তস্বর—
অত্যাচারীর গোপন অস্ত্র পাড়িয়াছে ভূমি'পর
নির্দ্দোষ মম ভ্রাতাভগিনীরে অন্যায় রোধী ধীর,
হায়রে অলস বাহুযুগ মোর ভাঙ কারা চৌচির।
হয়ত একটি নির্ভীক ভ্রাতা আজিকে সারাটি দিন
রক্ষিতে শত নির্দ্দোষ প্রাণ যুঝিয়াছে শ্রমহীন,
শেষে সে পড়েছে বৃক্ষ সমান বৈশাখ ঝটিকায়,
কে তাহার স্থানে দাঁড়াতে আছে রে,—ধিক্ ধিক্ হায় হায়!
মনে পড়ে আজ সন্ধ্যা এমনি ঘিরে ঘিরে আসে দিক—
দশ জন মোরা সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়ে অনিমিখ
ক্ষুব্ধ পিষ্ট ক্লিষ্ট দেশের মুক্ত করিতে দুখ
করেছিনু পণ,—আশা ও হর্ষ ভরে' ভরে' তুলে বুক
সে দিনের নিশা করে' দিয়েছিল জননীর শুভাশিস্—
পূত মঙ্গল পূজার নিমেষ; দেখেছিনু দিশে দিশ
পুণ্য আলোক হৃদয়াভিরাম। সেই দিন হতে সেই
দলে দলে বীর মন্ত্রে সুবক আসিল, শঙ্কা নেই।
কারার শঙ্কা মরার শঙ্কা কেটে গেল, নির্ভীক
লক্ষ তনয় দুঃখী মাতার জয়গানে ভরে' দিক
যাত্রা করিল দৃপ্ত সতেজ পরিয়া বর্ম্ম-সাজ;
আজি কি সকলি বিফল ভাগ্য নিহত, বিশ্বরাজ?
কে বলে বিফল কে বলে নিহত?—আজো রই আমি বেঁচে
আজো বাহু মোর শক্ত সুদৃঢ়, লব কি মরণ যেচে?
আকাশের পানে দেখিয়ে যাচিয়া নেমে গেছে কূল পানে,
ঐ ঐ দিকে অদেশ আমার ঐখানে ঐখানে,

ঐখানে সেথা দেখেছি সে দিন ঝাপ্‌সা ধোঁয়ায় ঢাকা
স্বদেশ-স্বর্গ জাগিছে আমার স্নেহ-প্রেম দিয়ে মাখা।
ব্যথিত পীড়িত ক্রন্দননত জননী স্বদেশ মোর
বেদনা তোমার সিন্ধু বাতাসে ছুটিয়া লাগায় ঘোর।
ঐ ধোঁয়া মাঝে সুদূর বেলায় শান্ত আকাশ-তলে
স্বদেশে আমার কি বা সে বেদনা অবিরাম ছলছলে!
আর্ত্তের উঠে ক্রন্দন-রোল দুঃখীর দুখতাপ
নির্দ্দোষ ক্ষত হৃদয় হইতে কত না সে পরিতাপ;
কত অন্যায় কত অবিচার অত্যাচারের ঘায়
বিহ্বল দেশতনয় কাতরে অন্তরে মোরে চায়।
প্রাণ কাতরায় যায় দিবা যায় ষষ্ঠ দিবস শেষ,
প্রভাতের আশা নিভে যায় যে রে, ভাঙি কিসে এই ক্লেশ?

সময়—রাত্রি।

নিদ্রা?—ঘুমাতে করে না লজ্জা?—কি শান্তি নিয়ে শু'স্
অন্তর জ্বালা কিসে জুড়াইল, দেশত্যাগী কাপুরুষ!
রাত্রি শীতল ঢালিছে উতুল শান্তি,—পাষাণ চাপ
এ যে মোর বুকে বাজিছে বিষম নির্দ্দয় অভিশাপ।
মুগ্ধ সিন্ধু প্রহরী ঘুমায়, স্তব্ধ সকল রব,
মোর অন্তরে জ্বলিছে আগুন, করিতেছে কলরব
বিফল আহত শতেক বাসনা দুর্দ্দম মনোবেগ
গর্জ্জন রত বজ্রগর্ভ যেন বৈশাখ মেঘ
ফাঁড়ি মৌনতা ছাড়ি হুঙ্কার ভেঙে দিতে চায় ঘুম
শান্তি দাত্রী নিথর রাত্রি মরুক্ সে নিঝ্‌ঝুম।
শান্তি কে চায়, কে চায় নিদ্রা, রাত্রি কে চায় বল্
চাহি চঞ্চল চপল দিবস, কর্ম্মমুখর পল,
উচ্ছ্বাসময় সিন্ধু আবার, উল্লাসময় তান,
শান্তিঘাতিনী সর্ব্বনাশের কৃপাণনিষ্ঠ প্রাণ।
মৌনতা টুটি উঠুক্ রে ফুটি দুর্দ্দম মম আশ,
উতল করুক্ নিথর রাত্রি দুরাশারি উল্লাস।

শ্রবণে যে আসে মর্ম্মপীড়িত বিধবার ব্যথা-সুর,
পুত্রবিহীন জনক জননী-ক্রন্দনে পরিপুর
স্বদেশ আমার, জাগিছে বেদন ঝরিতেছে আখি-নীর,
আমি যে ভর্ত্তা আমি যে পুত্র শত দুখী-দুখিনীর।
পাষাণ রাত্রি মৃত্যু-ধাত্রী, এত ব্যথা উচ্ছল
বক্ষে পুষিয়া নির্ব্বাক রহ ব্যথাহীন অচপল;
ও বুকে তোমার বাজে না বেদনা? মর্ম্মের শোক-বাণ
তোমারে বিঁধিয়া অস্থির করি তুলিবে না গতিমান?
দেশের লক্ষ দুখীর বেদনা আমার মরম-শোক
ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া টুটিয়া তোমারে উঠুক আকাশ-লোক;
কোন্ কোণে আছে কোথায় গোপনে বলি যারে ঈশ্বর
বাক্‌হীন মূক অন্যায়-পোষী;—মঙ্গল ভাস্বর?—
যদি কোথা থাকে যদি বা সে থাকে যদি কোনো নিরালায়
নাড়িয়া ঝাঁকিয়া বসুক্ আমার দুঃসহ ব্যথা তায়—
সে নহে পুরুষ নহে ধার্ম্মিক অন্যায়-নিবারক,
নহে ব্যথাহারী পুণ্য বিকাশ পিষ্টের রক্ষক;
ভীরু কাপুরুষ হৃদয়বিহীন অক্ষম দুর্ব্বল
অত্যাচারীর গুপ্ত পোষক, নিতি ভীতি-চঞ্চল।
যদি সে ধর্ম্মী জ্বলিয়া উঠুক্ পুণ্য-পাবক তার
অধর্ম্ম আর অন্যায় দহি' করে' দিক্ ছারখার।
ধরুক্ মূর্ত্তি করাল ভীষণ পাপনাশী শঙ্কর
তাথই তাথই নাচিয়া নাশুক্ অন্যায় ভূমি' পর।
আমি বিদ্রোহী দাপটি ঝাপটি শান্তি করিব শেষ,
হইব বিজয়ী জিনিয়া মৃত্যু নাই ঘুম সুখ-লেশ।
ঐ আছাড়িল সিন্ধু ঊর্ম্মি রাত্রির কাঁপে বুক,
কাঁপে বুক কাঁপে অন্তর মোর আছড়িছে সেথা দুখ।
লৌহকারায় লৌহ আঙুলে শাসিয়া বলিছে—"হায়,
বৃথা রে চপল তব আলোড়ন বৃথা নাচা দুরাশায়।
শোণিত শুষিয়া চুষিয়া মাংস পিষিয়া অস্থিচয়
বাসনা তোমার আশা উচ্ছ্বাস করে' দোব সবি লয়॥"

তার চেয়ে আজি রাত্রির বুকে মাগি চির অবসান
মাগিয়ে মৌন মৃত্যুর মাঝে হইতে মজ্জমান।
কিন্তু মরিতে বিষম বেদনা! নাহি রে মরিতে সাধ,
রাত্রির বুকে লুকাইয়া থাকি ঘটাই পরমাদ।
রাতির মৃত্যু নিবিড় কালিমা ভেদিয়া সূর্য্যবীর
যথা বাহিরায় শক্তি-পাবক দুর্জ্জয় অস্থির,
তেমনি বিষম ভীম দুর্দ্দম উন্মুখ মম প্রাণ,
এ প্রাণ লইয়া সুপ্তি মাথিয়া করিব রে অভিযান।

অন্নপূর্ণা

[শ্রীসুনীতিদেবী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস গত হইয়াছে। অন্নপূর্ণা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পরে যখন সেই মৃতদেহ লইয়া আকুলপ্রাণে মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মিত্রজা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৃতদেহের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "এস মা, আমার সঙ্গে এস।" তৎপর গৃহিণী ও অন্নপূর্ণাকে লইয়া তাঁহার কর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় তাহার পুত্র ও পুত্রবধু ছিলেন। অন্নপূর্ণা কেমন যেন উদাস প্রাণে নূতন স্থান সকল দেখিতে দেখিতে বাসায় আসিয়া পৌছিলেন। গাড়ী হইতে নামিবার সময় অবগুণ্ঠনবতী তরুণীকে দেখিয়া বিপিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে? পিতা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কন্যা।"

অন্নপূর্ণা আসিয়া রন্ধনগৃহের ভার লইলেন। মিত্র-গৃহিণীকে বলিলেন, "মা ব্রাহ্মণ রাখার প্রয়োজন নাই। আমিই রাঁধ্‌ব।"

বিপিনের স্ত্রী শৈলবালা অন্নপূর্ণার সমবয়সী। দেখিতে মন্দ নয়। তাঁহার স্বামী বিপিন শিক্ষিত, কিন্তু বড় সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি, নিজের চরিত্রও নির্ম্মল নহে। সন্দিহান হইয়া শৈলবালার প্রতি মাঝে মাঝে বড় অত্যাচার করিতেন। শৈলবালা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। প্রথমতঃ সে পরমাসুন্দরী,—

তাহার কাছে শৈলবালাকে কেহ সুন্দরী বলিবে না। দ্বিতীয়তঃ এ অনুপম রূপলাবণ্যবতী তাঁহার স্বামীর চক্ষে না পড়ে। অন্নপূর্ণার সহিত তিনি ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। যে তাহার বাড়ীর রাঁধুনী তাহার সঙ্গে—তিনি অবস্থাপন্ন লোকের স্ত্রী হইয়া সমবয়সীভাবে কথা কহিলে সম্মানহানির সম্ভাবনা। যাহা হউক, অন্নপূর্ণার সে জন্য কোন দুঃখ ছিল না। গৃহিণী তাহাকে ভালবাসিতেন, সেও তাঁহার খুব যত্ন করিত।

বিপিনের সাক্ষাতে অন্নপূর্ণা কখনও বাহির হইতেন না। সুতরাং তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যও বিপিনের চক্ষে পড়িত না। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ অন্নপূর্ণাকে একখানি গীতা দিয়াছিলেন। সে অবসর মত সেই গীতাখানি পাঠ করিত,—তাহাই তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল ও শান্তির উপায় ছিল।

একদিন অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া চুলগুলি খুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন অবস্থায় বিপিন তাহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, এমন অনুপম রূপ তিনি আর কোথাও দেখেন নাই!—দেখিয়াই তিনি মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিলেন। ইদানীং যথেষ্ট মদ খাইতেন,—তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তাই মদে বিভোর হইয়া থাকিতেন। সে দিন রাত্রিতে বিপিন বাসাতেই রহিলেন,—ইদানীং তিনি প্রায়ই থাকিতেন না।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ-মণ্ডল নিবিড় মেঘে আছন্ন। বায়ু স্থির,—ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া সকলেই সকাল সকাল কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া নিজ নিজ গৃহে কপাট বন্ধ করিয়াছে। দ্বিতলগৃহ, উপরে পাঁচটা ঘর। একটীতে কর্ত্তা ও গৃহিণী থাকিতেন, একটা বিপিনের শয়ন-ঘর, মাঝে দুইটি ঘরে জিনিষ-পত্র-পুস্তকাদি, পাশের ঘরটায় অন্নপূর্ণা একাকী শয়ন করিত। অন্নপূর্ণা শয়ন করিতে যাইয়া দেখিল, কপাটের খিলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে কপাট ভেজাইয়া, উহাকে একটি ছোট বাক্স ঠেকা দিয়া রাখিল। তৎপরে ঘরের জানালা খুলিয়া প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

বাতাস জোরে বহিতেছে। মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। পাশের ঘরে কথা কহিলেও অন্য ঘরে কাহারও শুনিবার সম্ভাবনা নাই! তাই অন্নপূর্ণা নিশ্চিন্ত হইয়া গাহিতেছিল—

কি যেন চাহে মন কি যেন চাহে,
জানি না ভাষা তার যে প্রকাশি তাহে;
কিসের আবেগে এ পরাণ আকুল,
কেমনে পা'ব তাহা জগতে অতুল!

দিন তো ক্রমে এল ফুরা'য়ে আমার,
এখনো কোথা যাহা জীবনের সার !
বিনা সে ধন যেন বাঁচি মরিয়ে,
যা'বে কি দিননাথ, এমনি করিয়ে !

যখন অন্নপূর্ণা আকুলপ্রাণে তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছিল, সেই সময় বিপিন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে সেই গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। সন্ধ্যার সময় গৃহের খিলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং গৃহে প্রবেশ করিবার কোন বাধা ছিল না। সেই ভীষণ ঝড় যখন রাশি রাশি গৃহ ভূমিসাৎ করিতেছিল, তেমনি সময় সে আস্তে আস্তে অন্নপূর্ণার গৃহের কপাট খুলিল। অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতেই সহসা অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়া সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল !

সেই নেশার ঘোরে কাণে বাজিতে লাগিল, "কি যেন চাহে মন কি যেন চাহে !" বাহিরে ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন, ঝটিকার প্রচণ্ড আঘাতে, গৃহগুলি যেন কাঁপিতেছিল। তাহার মনের ভিতরও তেমনি প্রচণ্ড ঝটিকা বহিতে লাগিল। সে তখন আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে কেবল এই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল, "মন কি চাহে মা ?"

(৯)

প্রভাত হইয়াছে। প্রথমে মেঘের হাত এড়াইয়া সূর্য্যদেব যেন উঠিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন। বিপিন শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। সেখানে তখন জনপ্রাণী ছিল না। আকাশপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এই ত ঝড়-বৃষ্টির পরে আকাশের মেঘ কাটিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। আমার এই পাপ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে কি জ্ঞান-সূর্য্য উদয় হইবে না ? এই ত সূর্য্যালোক উদ্ভাসিত জগৎ হাসিতেছে, আমার হৃদয় কি জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া শান্তি-কিরণে হাসিবে না ? "দিন ত এলো ফুরায়ে আমার, এখনো কোথা যাহা জীবনের সার",—এ জীবনের সার কি ? এতদিন ত ভোগেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেছি। অথচ তাহাতে কি কখনও শান্তি পাইয়াছি ? কি একটা অভাব যেন সর্ব্বদাই অনুভূত হইয়াছে ! দিন ত ফুরাইয়ে আসিল, —কে আমাকে বলিয়া দিবে মা, "কিসের আবেগে এ পরাণ আকুল ?" যে স্ত্রীজাতিকে আমি জ্ঞানহীনা বলিয়া ঘৃণা করিতাম, আজ সেই স্ত্রীজাতি আমার

অন্ধত্ব ঘুচাইয়া, আমাকে দিব্য জ্যোতিঃ প্রদান করিলেন ! যাঁহার কৃপায় আমি এ নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি,—পাষণ্ড আমি সেই জননীকে অবমাননা করিতে গিয়াছিলাম ! ধিক্ আমাকে ! তিনি নিশ্চয়ই জানেন, মন কি চাহে। কিন্তু যে নরক হৃদয়ে লইয়া সেই পবিত্র দেব-মন্দির কলঙ্কিত করিতে গিয়াছিলাম, কোন্ মুখে আবার সে গৃহের সম্মুখীন হইব ? তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিব,—এ জীবনের সার কি ?"

এমন সময় রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল,—

"খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্ খুঁজ্‌রে পা'বি
হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।"

সহসা বিপিন "জয় দীননাথ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আকাশের মেঘের সঙ্গে আজ যেন তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। "যে ধন জগতে অতুল" প্রাণ-মন দিয়া খুঁজিলে তাহা হৃদয়ের মধ্যেই পাইবে !—এই আশায় তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। বাসা হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে একটা বিস্তৃত প্রান্তর, তৎ-সন্নিকটে একটি বটবৃক্ষচ্ছায়ে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বিপিন পায়চারি করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির উদার দৃশ্য তাঁহার প্রাণে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় সুপ্ত ভাবকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। বিপিন কতদিন এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন, আরতো কোন দিন এমন লাগে নাই ?

বেলা প্রায় প্রহরাতীত। চাকর আসিয়া ডাকিল, 'বাবু, মা ডাকিতেছেন।" বিপিনের চমক ভাঙ্গিল। "এই যাচ্ছি, তুমি যাও,"—বলিয়া ভৃত্যকে বিদায় দিলেন।

বিপিনের বড় গরম বোধ হইতেছিল। ভাবিলেন, পুকুর হইতে স্নান করিয়া যাই। পূর্ব্বদিনের ঝড় বৃষ্টিতে ঘাটের অবস্থা বড় খারাপ হইয়াছিল। বিপিন যেমন নামিতে গিয়াছেন, অমনি হঠাৎ পা পিছলাইয়া গড়াইতে গড়াইতে শানের উপর পড়িয়া বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

জ্ঞান হইলে দেখিতে পাইলেন, তিনি একটি অপূর্ব্বদৃষ্ট নূতন গৃহে শয়ান রহিয়াছেন। সম্মুখে অপরিচিত একটি ভদ্রলোক, বসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। বিপিনের জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া চাকরকে গরম দুধ্ আনিতে বলিলেন। দুধ্ আসিলে নিজের হাতে বিপিনকে খাওয়াইতে গেলেন। বিপিন বলিলেন, "আমি কোথায় ?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আগে একটু সুস্থ হয়ে

নন্, পরে সে কথা হ'বে।" দুধ পান করিয়া বিপিন কহিলেন, 'আপনি কে? আর ত কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না, অথচ পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "এ স্থানে আমি নূতন আসিয়াছি। আমার নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।"

"ওঃ, আপনি এখানকার নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট? আপনার নাম শুনিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে আপনি অচেনা লোককেও এমন আত্মীয়ের মত যত্ন করেন।"

বিনোদ হাসিয়া কহিলেন, "আমাকে ওরূপ অবস্থায় পতিত দেখিলে কি আপনি ফেলিয়া যাইতে পারিতেন। ইহাতে মানুষকে ধন্যবাদ দিবার কি আছে?"

বিপিন বাসায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিনোদলাল তাঁহাকে পাল্কি করিয়া পাঠাইয়া নিজে সঙ্গে চলিলেন।

(১০)

বিপিনের সঙ্গে এই সূত্রে বিনোদের বেশ সদ্ভাব জন্মিল। একদিন বিপিনের মাতা বিনোদের বাসায় বেড়াইতে আসিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী সুরমাকে তাঁহার বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। সুরমা যাইতে স্বীকৃত হইলেন, ও বিনোদকে বলিয়া পরদিন বিনোদের বাসায় বেড়াইতে গেলেন।

শৈলবালার সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সুরমা ঘুরিয়া ঘরগুলি দেখিতেছিলেন। অন্নপূর্ণার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি পরমা সুন্দরী তরুণী জানালার কাছে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া যেন গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে!

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" শৈল বলিলেন, "আমাদের রাঁধুনী বামনী।" সুরমা কহিলেন, "বাঃ চমৎকার সুন্দরী কিন্তু। দেখিলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।" শৈল সুরমাকে ডাকিলেন, "আসুন।" সুরমার যেন সেখান থেকে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। শৈল আবার ডাকিলেন, অগত্যা সুরমাকে আসিতে হইল। কিছু জল খাইবার আয়োজন করিয়া গৃহিণী ডাকিতেছিলেন। সুরমা কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া, শৈলবালার সঙ্গে একটা নিভৃত কক্ষে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটীর বাড়ী কোথায় জানেন কি?"

শৈল। আমি বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, বাড়ী ঘর থাকিলে কি আর পথে পথে বেড়ায়?

সুর। ওঁকে আপনার কি রকম প্রকৃতির মনে হয়?

শৈল। জানি না, তবে সচ্চরিত্রা হইলে এই বয়সে গৃহের বাহির হইল কেন? ওর হাতে একটি বহু মূল্যবান্ আংটী আছে। আমি ত ইংরাজি জানি না, তাহাতে ইংরাজিতে কাহার নাম লেখা আছে। খুব বড় লোক ভিন্ন ওরূপ আংটী সাধারণের সম্ভবে না। উহার নিজস্ব হইলে উহা বিক্রয় করিয়াও ত কতদিন চালাইতে পারিত। উহার শ্বশুর কিম্বা বাপের একটা ভিটাও কি নাই? তাহাতেই মনে হয়, উহার প্রণয়াস্পদ কেহ আংটী দিয়াছে, প্রণয়-চিহ্ন বলিয়া বিক্রয় করে নাই।

সুর। এ তো সব আন্দাজী কথা। কিন্তু আমার মনে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না,—আপনি কি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

শৈল চুপি চুপি সুরমার কর্ণে মুখ সংলগ্ন করিয়া কি একটা কথা বলিলেন, শুনিয়া সুরমা শিহরিয়া উঠিলেন।

বেলা শেষ। সূর্য্যদেবকে গমনোন্মুখ দেখিয়া সুরমা সেদিনকার মত বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনটা যেন বড়ই ভারাক্রান্ত বোধ হইতে লাগিল।

(১১)

বিনোদ অত্যন্ত প্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "সুরমা!"

সুরমা রাধিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

বি। আমি যে আনন্দ রাখিবার জায়গা পাইতেছি না, তাই তোমাকে বিলাইতে আসিয়াছি।

সু। ব্যাপার কি তাই বল না?

বি। তোমার কাছে যাহা শুনিয়াছিলাম, মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। আজ কথাপ্রসঙ্গে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমাদের পাচিকা ব্রাহ্মণী নাকি ভারী সুন্দরী? তোমরা তাহাকে কোথায় পাইলে? বিপিন কহিল, কাশীধামে এক ব্রাহ্মণ মৃত্যুর সময়ে তাঁহার কন্যাকে বাবার কাছে রাখিয়া যান। ব্রাহ্মণের পরিচয় জানি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাঁহার প্রকৃতি তোমার কেমন মনে হয়? বিপিন বলিল, আমার

মনে হয়, তিনি দেবী নহিলে আমার মত মহাপাপিষ্ঠের মতি ফিরিয়া যায়? আমি বলিলাম, তোমার কথার অর্থ তো আমি বুঝিলাম না।

বিপিন কহিল,—আমি তাঁহাকে মনে মনে মাতৃ সম্বোধন করিয়াছি, সুতরাং মা-ই বলিব। তিনি কোন দিন আমার সমক্ষে বাহির হন নাই, সুতরাং আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না। একদিন, সেই ভীষণ ঝড়ের দিন, তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এই পাষণ্ডের চক্ষে পড়িল। আজ আমার পাপের কাহিনী তোমাকে বলিয়া আমার হৃদয়ের ভার লঘু করিব। তাঁহাকে দেখিয়া তখন আমার মনে হইল, যেমন করিয়া হউক ইহাকে পাইতে হইবে কিন্তু সে কথা এখন মুখে বলিলেও পাপ বলিয়া মনে হইতেছে।

সেই ভীষণ ঝড়ের সময়ে আস্তে আস্তে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম,—ইহাতে পলাইবার পথ নাই, রক্ষা করিবারও কেহ নাই, সুতরাং আমার পথ—থাক্। অকস্মাৎ কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত আমার কাণে প্রবেশ করিয়া, এ দগ্ধ প্রাণে যেন অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে পাইলাম। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিল, আমি অতি সন্তর্পণে সে ঘর হইতে আমার শয়ন গৃহাভিমুখে চলিলাম।

বিপিনের সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা হইল, সে সব কথায় তোমার প্রয়োজন নাই। এইবার বিপিনের স্ত্রীর কথার সঙ্গে মিলিতেছে কি না? ঝড়ের দিন তো তিনি দেখিয়াছেন, বলিয়াছিলেন? আর সেই মেয়েটীকে জিজ্ঞাসা করায় যে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? তিনি তো কিছুই টের পান নাই। বিপিনের স্ত্রী যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু তাহাতে তো কোন ক্ষোভের কারণ নাই। সে গানটা আমি লিখিয়া আনিয়াছি, তোমাকে দেখাইব।

সুরমা আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বাস্তবিক দেবী মূর্ত্তি যেন! এমন সৌন্দর্য্য মানুষে এখন পর্য্যন্ত দেখি নাই।—দেখি, সে গানটি কি?"

বিনোদ দেখাইলেন। তৎপর বলিলেন, "শোন সুরমা, আমার কেন এত আনন্দ হইতেছে। তোমার কথা শুনিয়া অবধি আমার কেবলই মনে হইতেছিল,—এই যদি সতীশের স্ত্রী হয়! কিন্তু যেরূপ প্রমাণ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আর সে সম্বন্ধে খোঁজ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। এখন আমার মন অত্যন্ত অধীর হইতেছে। তাহাকে আর একদিন কোন ছলে আনিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি বাস্তবিকই সতীশের স্ত্রী অন্নপূর্ণা

হয়, তবে কত সুখের হইবে!—সুরমা, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দে অধীর হইতেছি। আমার প্রাণ-প্রতিম বন্ধু সতীশ একাকী,—আর আমি তোমার সঙ্গে কত সুখে দিন কাটাইতেছি, ভাবিলে আমার মন যেন কেমন করে! সে তো স্থির করিয়া বসিয়া আছে, দেশের এবং দশের কাজে জীবনটা কাটাইয়া দিবে। আর বিবাহ করিবে না,—ইহা তাহার স্থির সঙ্কল্প। যদি অন্নপূর্ণাকে আনিয়া ভাহাকে দিতে পারিতাম, তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিতাম,—তবে আমার কত আনন্দ, কত সুখ হইত! যাই হোক্ সুরমা, আর দেরী করিয়া কাজ নাই। কালই তাহাদের নিমন্ত্রণ করি;—তুমি কি বল?"

সুরমাও অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, 'আমি আপত্তি করিব নাকি?"

(১২)

অন্নপূর্ণা এবং বিপিনদের বাসার সকলে পরদিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বিনোদের বাসার আসিয়াছেন।

সুরমা রন্ধনকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। ক্ষিপ্রহস্তে সকল কাজ সারিতেছেন। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সুরমার বড় কষ্ট হইতেছে। তখন তিনিও সুরমার সাহায্যে প্রবৃত্তা হইলেন। যখন যাহা জোগাড়ের প্রয়োজন বুঝিতেছেন, তখনই তাহা করিতেছেন। সুরমা নিষেধ করিলেন না। সকলের আহারাদি শেষ হইলে শৈলবালা ও তাঁহার শ্বশ্রূর সঙ্গে সুরমার কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইল। তৎপরে বিপিনের মাতা বলিলেন, "তবে আজ আসি মা, বেলা গিয়াছে।"

সুরমা বলিলেন, "আমার শরীর কিছু অসুস্থ বোধ হইতেছে। আপনার রাঁধুনিকে যদি আজ রাখিয়া যান, তবে আমার বড় উপকার হয়।" বিপিনের মাতা সম্মত হইয়া কহিলেন, "সে কি মা, তোমার অসুখ-বিসুখ হইলে, শুধু রাঁধুনি কেন, আমরাও তোমার কাজ করিয়া দিব। এখন তবে যাই।"

বিপিনের মাতা প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিলে, সুরমা অন্নপূর্ণার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "চল ভাই, আমরা ছাতে যাই।" উভয়ে ছাতে চলিলেন।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ মাঠ। সেই দৃশ্য দেখিয়া অন্নপূর্ণার মন যেন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

সুরমা বলিলেন, "ভাই, এ পর্য্যন্ত কথা বলিবার অবকাশ ঘটে নাই। এখন এস, এখানে বসিয়া তোমার অতীত জীবনের কাহিনী শুনিব। আগে বল, তোমার নাম কি অন্নপূর্ণা?"

সুরমার মিষ্ট ব্যবহার অন্নপূর্ণার প্রাণ স্পর্শ করিল;—এমন ব্যবহার তিনি আর কোন রমণীর নিকট পান নাই। এমন লোকের কাছে তাঁহার আত্ম-কাহিনী বলিতে কোন আপত্তি হইল না। কিন্তু অপরিচিতার মুখে তিনি নিজনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন;—এখানে তো কেহ জানে না যে তাঁহার নাম অন্নপূর্ণা? এখানে যে তিনি অন্য নামে পরিচিতা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি করিয়া জানিলেন যে আমার নাম অন্নপূর্ণা?"

সুরমা তাঁহার প্রার্থিত উত্তর পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে 'আপনি' বলিও না ভাই, আমাকে তোমার সখী বলিয়া জানিও। তুমি আমায় চেন না বটে, কিন্তু আমরা তোমাকে চিনিয়াছি!"

বিস্মিতা হইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কেমন করিয়া চিনিলেন?"

সুরমা বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া প্রথমে সন্দেহ হয়। তারপর, আজ তোমার হাতের আংটীতে তোমার স্বামীর নাম দেখিয়া চিনিয়াছি;—বুঝিয়াছি, তুমি আমার স্বামীর বন্ধু সতীশ বাবুর জলমগ্না স্ত্রী অন্নপূর্ণা। আর তোমার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে একটি তিল আছে, ইহাও তোমার স্বামীর মুখে শুনিয়াছিলাম। এখন তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে এখানে আসিলে, তাহা জানিতে বড় আগ্রহ হইতেছে।"

অন্নপূর্ণা বলিতে লাগিলেন, "পিতার সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী হইতে রওনা হইয়া যখন একটা বড় নদীর মাঝখানে আসিলাম, তখন হঠাৎ বানচা'ল হইয়া নৌকা ডুবিতে লাগিল। বাবা ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিলাম। তিনি সম্ভবতঃ ঘুমের ঘোরেই বলিয়া উঠিলেন, 'মা আমাকে ডাকৃছেন, আমি যাই।' নৌকা ডুবিল; বাবা চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই মা, ভগবান্ আছেন, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন।'—শুনিতে শুনিতে ডুবিলাম। অল্প অল্প সাঁতার জানিতাম, কিন্তু সে প্রবল স্রোতে সাধ্য কি যে কূলের দিকে অগ্রসর হই? তখন একবার বাবার কথিত সেই পুরাণ পুরুষকে মনে পড়িল। তা'র পরে কি হইল, মনে নাই। যখন চক্ষু মেলিলাম, দেখিলাম একজন প্রাচীনা আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ করুণ দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। সংসারে তিনি এবং তাঁর স্বামী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁদের সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাঁ'রা আমাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতই দেখিতেন। মায়ের স্নেহ যে কি বস্তু তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, এখানে আসিয়া তাহা অনুভব করিতে পারিলাম। আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম। আহা! সেই মায়ের

মত মা-ই বা ক'জনের ভাগ্যে মিলে! ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তিনি তোমাকে শ্বশুর বাড়া পাঠাইয়া দিলেন না কেন?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "একদিন মা তাহাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন যে আর পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার স্বামী-দর্শন ঘটিবে না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। আড়ালে থাকিয়া আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়াছিলাম, সুতরাং আমিও আর কিছু বলিনাই। তারপর চারিবৎসর পরে সে মাতাও আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। তিনি বড় সাধ্বী ছিলেন। তাঁর শোকে কিছু কাতর হইয়াছিলাম। পিতৃতুল্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, গীতার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। ক্রমে মন অনেকটা শান্ত হইল। শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। শেষ দিন নিকট জানিয়া তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দশ-বার দিন পূর্ব্বে আমরা ৺ কাশীধামে পৌছি।"

তৎপর তথা হইতে যে ভাবে মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে অন্নপূর্ণা মুঙ্গের আসিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।

(১৩)

এমন সময়ে বিনোদলাল বাড়ী আসিয়াছেন সাড়া পাইয়া সুরমা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং স্বামীকে বলিলেন, "অনুমান সত্য। সতীশ বাবুকে আসিবার জন্য আজই তার কর, দেরী করিও না।"

বিনোদ সহাস্যে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সতীশচন্দ্র আসিয়াছেন। শশব্যাস্তে আসিয়া দেখিলেন, বিনোদলাল তাঁহারই প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া আছেন। সতীশ বলিলেন, "তোমাকে তো ভাই সুস্থ শরীরে দেখিতেছি। তবে কি জন্য আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছ?"

বিনোদ সহাস্যে বলিলেন, "কেন আমাকে কি রুগ্ন অবস্থায় দেখিতে চাও নাকি? না হয়, দু'দিন কালেজে অন্য কেহ তোমার পরিবর্ত্তে অধ্যাপনা করিবেন।" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে উভয়ে বাসায় আসিলেন।

বিনোদ বলিলেন, "ভাই, আর কতদিন বিবাহ না করিয়া থাকিবে? তোমাকে সংসারে একাকী ভাবিয়া আমার বড় কষ্ট হয়। তাই আমি পাত্রী

স্থির করিয়াছি, এবার তোমার ঘাড়ে চাপাইব। তুমি যাই বল, তোমার কথা আর শুনিব না। আমার কথা তোমাকে শুনিতেই হইবে।"

বিস্মিত সতীশ বলিলেন, "সে কি? এই জন্যই কি কারণ না জানাইয়া আসিতে বলিয়াছ? কিন্তু ভাই,"—

বিনোদ। আর কিন্তু-টিন্তু শুনিব না। এবার তোমাকে একাকী ছাড়িয়া দিব না।

সতীশ। একাকী কি ভাই? আমার কত ছেলে রহিয়াছে। তোমার মত বন্ধু আছে, ঘরে মা আছেন;—কেমন করিয়া একাকী হইলাম?

বিনোদ। বাজে কথায় কাজ নাই। এখন বল, কি প্রকার পাত্রী দেখিতে চাও? এখন তো নানারূপে পরীক্ষা করে, তুমি কি ভাবে পরীক্ষা করিবে?

সতীশ একটু বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংকল্প, দেশের এবং দশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন, আর বিবাহ করিবেন না। তাঁহার সে সঙ্কল্প বুঝি বিনোদ ঘুচাইয়া দিবে। মন খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন,—মন বিবাহে ইচ্ছুক নহে! এখনও অন্নপূর্ণার সেই মুখখানি সতীশ ভুলিতে পারেন নাই। এখনও তাহার আশা ছাড়েন নাই।

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "বলি, একেবারে নিরুত্তর যে? তবে আমি আমার পছন্দ মত পরীক্ষা করিব। আমার মতে স্ত্রীর হাতের রান্না না খেলে তৃপ্তি হয় না। সেই জন্য আমি বামুন রাখি না। তবে রান্না খেয়েই পরীক্ষা করা যা'ক।"

সতীশ কিছুই বলিলেন না। বিনোদের সকল কথা তাঁহার কাণে গিয়েছিল কিনা, সন্দেহ। এখনও তাঁহার পক্ষে অন্নপূর্ণা আছে। বিবাহ করিলে বুঝি আর আসিবে না! বিনোদ বন্ধুর মনের ভাব বুঝিলেন! তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে আসিতে দেখিলেন, অন্নপূর্ণা অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের কথা শুনিতেছে;—চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছে! বিনোদ পূর্ব্বে কখনও অন্নপূর্ণাকে দেখেন নাই। আজ দেখিয়া ভাবিলেন,—বাস্তবিক এ মুখ ভুলিবার নহে!

বিনোদ বাহিরে আসিয়া সতীশকে বলিলেন, "আর ভাবিলে কি হইবে? যাহা স্থির করিয়াছি তাহা করিতেই হইবে। এখন চল; নাইতে যাই।"

সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন। আর অন্নপূর্ণা? তাঁহার মন যে আজ কি করিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন! তিনি সুরমার কাছে পূর্ব্বে সকল

কথা শুনিয়াছিলেন। তার পর স্বকর্ণে সতীশের কথা শুনিলেন। আনন্দে তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল!

সুরমা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুন্‌লে তো ভাই, তোমাকে আজ রাঁধ্‌তে হ'বে।" অন্নপূর্ণা রন্ধনশালে গেলেন। বাল্যাবধি তিনি রন্ধনে অভ্যস্তা ছিলেন, কিন্তু আজিকার মত এত আনন্দ তো আর কখনও হয় নাই! তাঁহার মন অনেক সময়েই অন্তর্জগতে ঘুরিয়া বেড়াইত, এ জন্য তিনি একটু অন্যমনস্কা ছিলেন। শৈলবালার কাছে কত সময়ে এ নিমিত্ত তিরস্কৃত হইয়াছেন। সেই মন যেন আজ বাহ্যজগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই অন্তর্নিবিষ্ট হইতে চাহিতেছে না। রন্ধনাদি শেষ হইল,—তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সুরমার আনন্দ যেন ধরিতেছে না! দুইটী সখী একত্র হইয়া বড় সুখ দুঃখের কাহিনী বলিতে ও শুনিতে লাগিলেন। সকারণ, অকারণ, কতবার হাসিলেন, কতবার কাঁদিলেন!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, দুই বন্ধু আহারে বসিলেন। সুরমা বলিলেন, "ভাই অন্নপূর্ণা, আজ তোমার পরিবেশন কর্‌তে হ'বে।" অন্নপূর্ণা আজ আপত্তি করিলেন না।

(১৪)

সতীশকে বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, রান্না খেয়ে রাঁধুনীকে পছন্দ হ'বে তো? আমার কিন্তু খুব পছন্দ হ'চ্চে।"

সতীশ এবার হাসিয়া কহিলেন, "তবে আর কি? বৌদিদি শুনলে রাগ কর্‌বেন,—তা তুমিই না হয় বিয়ে কর। কুলীনের ঘরে বেমানান হবে না।"

পাতে ভাত নাই দেখিয়া অন্নপূর্ণা পুনর্ব্বার ভাত দিতে আসিলেন। সহসা তাঁহার অঙ্গুলির দিকে সতীশের চোখ পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না। আহারান্তে বিনোদের বিশ্রামগৃহে বসিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনোদ, ইনি কে?"

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "এখন কেন গো?

সতীশ। বলনা ভাই, তুমি কি বুঝিতেছ না আমার মন কি করিতেছে!

বিনোদ। কেন? দেখ্‌লেই তো চিন্‌তে পার্‌বে বলেছিলে?

সতীশ। আমি তো দেখি নাই, কিন্তু বল বিনোদ, এই কি সেই অন্নপূর্ণা?

বিনোদ। তোমার ভাবী স্ত্রী।

সতীশ। ঠাট্টা রাখ, বল ইঁহাকে কোথায় কি ভাবে পাইলে?

এবার বিনোদ যাহা যাহা জানিয়াছিলেন, সকলই সতীশকে বলিলেন। সতীশচন্দ্র স্থিরভাবে সকল কথা শুনিলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কোন প্রকার চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল না। হৃদয়ের আনন্দের প্রতিবিম্ব তাঁহার নয়নদ্বয়ে প্রতিফলিত হইতেছিল।

এ দিকে সুরমা ও অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিলেন। সুরমা অন্নপূর্ণার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, ছাতে যাই।"

উভয়ে ছাতের উপর গিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন সুরমা কতকগুলি ফুল ও ফুলের মালা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি ভাই?"

সুরমা কহিলেন, "আজ তোমার যথার্থ বিবাহ। এই অনন্ত অসীম নীল-চন্দ্রাতপতলে অগ্নি-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সাক্ষী, তুমি আপনি আজ আত্মসমর্পণ করিবে। তাই আজ তোমাকে ফুলের সাজে সাজাইব।"

অন্নপূর্ণা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ফুট্ ফুটে জ্যোৎস্না তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার কাছে বাহ্য ও অন্তর্জগৎ যেন একাকার দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আত্ম-হারা হইয়া চির-মঙ্গলময়ের উদ্দেশে যুক্তকরে ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে নমস্কার করিলেন।

সুরমা ততক্ষণ অন্নপূর্ণাকে সাজাইতেছিলেন। ফুলের সাজে সজ্জিতা অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সুরমার মনে হইতে লাগিল, আজ এই অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-বতীকে দেখিয়া সতীশবাবুর না জানি কত সুখ, কত আনন্দ হইবে! তাহা ভাবিয়াও আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে! প্রকাশ্যে অন্নপূর্ণাকে বলি-লেন, "ভাই, আমি তবে চলিলাম। সতীশবাবুকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

অন্নপূর্ণা স্থিরভাবে বসিয়া অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র আসিলেন, অদূরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে সেই পবিত্রতা মাখা অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন —তাঁহার মনে হইতেছিল, মূর্ত্তিমতী সাধনা যেন ভগবানের আরাধনা করিতেছে। পরে ধীর পদবিক্ষেপে অন্নপূর্ণার সম্মুখে আসিলেন। আজ সামান্য পদশব্দে অন্নপূর্ণার ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ধ্যানের দেবতা, —যাঁহাকে এতদিন মনে মনে পূজা করিয়াছেন,—ধ্যানে যাঁহার কল্পিত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—যে পাদপদ্ম দর্শনাশায় অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও বাঁচিতে সাধ হইয়াছে,—যাঁর স্মরণে আনন্দ, দর্শনে আনন্দ, সেই পরমানন্দময়

স্বামী,—তাঁহার সেই সারাৎসার পরাৎপর,—তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত রত্ন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে উঠিয়া শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার স্বামীর পাদমূলে নিপতিতা হইলেন, সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া অশ্রু বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন—প্রভু এতদিনে কি দাসীর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে? তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

সুরমা অন্তরালে থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাহার মনে হইতেছিল ভগবানের পাদপদ্মে যেন ভক্তি-কুসুম আপনাকে অ-র্পন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন! তাহার চক্ষে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল।

সতীশচন্দ্র সাদরে অন্নপূর্ণার হস্ত ধারণ করিয়া স্নেহার্দ্র কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন —"এস আমার অন্নপূর্ণা! আমার আঁধার ঘরের আলো! এস আমার গৃহলক্ষ্মী! এখন আমার গৃহে চল।"

বাঙ্গালা ও তামিল উচ্চারণ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

আমরা লিখি 'কাক,' বলি 'কাগ'; লিখি 'শাক,' বলি 'শাগ'; লিখি 'বক,' 'শকুন,' 'খাত,' 'পাক,' 'ছাত,' 'গাত,' 'শোক,' প্রভৃতি; কিন্তু বলি 'বগ,' 'শগুন,' 'খাদ' (যেমন 'স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি'), 'পাগ' ('গুড়ের পাগ'), 'গাদ' ('গরুটা গাদে পড়েছে'), 'শোগ' ('রোগে শোগে') প্রভৃতি। আবার সংস্কৃত 'কৃপা স্থানে প্রাকৃতে হয় 'কিবা,; 'ঋতু' স্থানে 'উদু,' 'রজত' স্থানে 'আঅদ', আগত স্থানে 'আঅদ', 'নিবৃত্তি' স্থানে 'নিব্বুদি', 'আকৃতি' স্থানে 'আইদি', 'সংযত' স্থানে 'সংজদ', 'শাপ' স্থানে 'সাব', 'শপথ' স্থানে 'সবহ', 'উলপ স্থানে 'উলব', 'উপসর্গ' স্থানে 'উবসগগ', 'কপাল' স্থানে 'কবাল', 'কোপ' স্থানে 'কোব', 'নট' স্থানে 'ণড়', 'বিটপ' স্থানে 'বিড়ব', 'কটু' স্থানে 'কড়ু', ইত্যাদি। সংস্কৃত 'কৃথ' ধাতু স্থানে প্রাকৃতে 'কঢ়', 'বেষ্ট' স্থানে 'বেঢ়ু', 'পত' স্থানে 'পড়', স্ফুট স্থানে 'ফুড়', 'পঠ' স্থানে 'পঢ়', ইত্যাদি। এই-সকল স্থানে অনাদি শ্বাসবর্ণ হয়; কিন্তু কারণ কি? হইলে স্বরবর্ণের পুর্ব্বে শ্বাসবর্ণের

নাদবর্ণতা সংস্কৃতেরও নিয়ম ; যেমন দিগন্ত, বাগীশ। 'দিকন্ত' বা বাকীশ' কি আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত হইতে পারে না ?

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গোঁড়া ভক্ত যে হিন্দু বেদের ভাষা হইতে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার উদ্ভব কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, যাঁহার উদ্ভাবনীশক্তির অপূর্ব্ব কৌশলে সংস্কৃত 'পুস্তক' হইতে আরবী 'কিতাব' নিষ্পন্ন হয় *, তাঁহার নিকট আমার নিবেদন এই যে তিনি এ প্রবন্ধ পাঠ না করিলে লেখক ও পাঠক উভয়েরই সুবিধা। কিন্তু যে সহিষ্ণু পাঠক স্বীকার করিতে পারেন যে দুই জাতি একত্র বাস করিলে উভয় জাতির ভাষা পরস্পরের ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানের একত্র সম্পর্কে উর্দুর ন্যায় মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হইতে পারে, ইরাণীয় ও সেমিতীয় জাতির একত্রনিবন্ধন আধুনিক পারস্য ভাষা প্রসূত হইতে পারে, ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলনে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা পরস্পর প্রভাবান্বিত হইতে পারে, তিনি বিচার করিয়া দেখিলে আশ্বস্ত হইবেন যে যে আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতি ভারতবর্ষে একত্র হইবার পর আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের আধুনিক ভাষাসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই দ্রাবিড়জাতিসমূহের ভাষায় এমন একটা উচ্চারণ নিয়ম প্রচলিত আছে যাহা আমাদের এই উচ্চারণের অনুরূপ। দ্রাবিড় ভাষাসমূহের মধ্যে তামিল ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। এই ভাষায় বর্ণমালায় স্পর্শ বর্ণের উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রতি বর্গে দুইটি বর্ণ ;—প্রথম বর্ণ ও পঞ্চম বর্ণ। অন্য বর্ণের আবশ্যকতা ইহাদের হয় নাই। মহাপ্রাণ বর্ণ ইহাদের নাই ; উচ্চারণেও নাই, লিপিতেও নাই। কিন্তু শ্বাসবর্ণ ও নাদবর্ণ উভয়েরই উচ্চারণ থাকিলেও লিখিবার সময় বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। কারণ ইঁহাদের উচ্চারণ প্রণালীতে এমন একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে যে তাহাতে এক বর্ণের দ্বারা দ্বিবিধ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না। ইঁহাদের সেই বিধিটা এই :—

"তামিল প্রভৃতি ভাষায় অনাদি অযুক্ত শ্বাসবর্ণের উচ্চারণ নাদবর্ণের ন্যায় হয় ; কোনও বর্ণ দ্বিগুণিত হইলে তাহার শ্বাস উচ্চারণ হয় ; পদাদিতে দ্বিগুণিত বর্ণ থাকে না।"

* আরবেরা দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখে বলিয়া সংস্কৃত 'পুস্তক' ইহারা 'কতপু' পড়িয়াছে ; এবং ইহাদের ভাষায় স্বরবর্ণের নিতান্ত বিশৃঙ্খলতাবশতঃ 'কতপু' স্থানে 'কিতাপ' বা 'কিতাব' হইয়াছে।

এই বিধি এত প্রবল যে সংস্কৃত, ইংরাজী বা অন্য কোনও ভাষার শব্দ তামিল ভাষায় গৃহীত হইলে এই বিধির অনুরূপ তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে। সংস্কৃত 'দন্ত' শব্দ তামিল ভাষায় লিখিত হইবে 'তন্তম্', পঠিত হইবে 'তন্দম্'। সংস্কৃত 'ভাগ্য' লিখিত ও পঠিত হইবে, 'পাক্কিয়ম্'।

এসিয়া ও ইউরোপের আধুনিক বা প্রাচীন আর্য্যভাষাসমূহে এ-প্রকার বর্ণব্যত্যয়ের বিধি নাই। তবে এরূপ উচ্চারণ তামিল ভাষায় আসিল কি প্রকারে ? যদি ভারতবর্ষে এই উচ্চারণ প্রথম উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে সংস্কৃত হইতে তামিলে এ উচ্চারণের সংক্রমণ যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় না কিন্তু সংস্কৃত যেরূপ রক্ষণশীল ভাষা তাহাতে অন্যান্য আর্য্যভাষায় যে বিধির কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না এরূপ বিধি সংস্কৃতে থাকিলে বলিতেই হইবে যে সে-সকল দ্রাবিড় দস্যু (বা ভবিষ্যতে শূদ্রত্বে উন্নীত) জাতির সহিত আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে শত্রুভাবেই হউক আর মিত্রভাবেই হউক মিশিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান আবশ্যক হওয়ায় তাহাদিগের পক্ষে যেমন সংস্কৃতবহুল ভাষার ব্যবহার অপরিত্যাজ্য হইয়াছিল, আর্য্যগণের পক্ষেও সেইরূপ দ্রাবিড়ী ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এবং এই প্রভাবই সংস্কৃত ভাষার উপর বহিঃপ্রভাব। এই প্রভাবই সংস্কৃতের পক্ষে অন্যান্য আর্য্যভাষায় অপ্রাপ্য বিশিষ্টতার হেতু। হিব্রু-ভাষায় ব, গ, দ ও ক, ফ, থ, বর্ণের পরিবর্ত্তন কতকটা তামিল ভাষার এই পরিবর্ত্তনের অনুরূপ। হিব্রুর Be GaD ও Ke PHa TH বর্ণসমূহের স্থান বিশেষে দ্বিবিধ উচ্চারণ হয়। সে বিষয়ে আমরা অধিক আলোচনা করিব না। কারণ হিব্রুর নিয়মও তামিলের নিয়মে সম্পূর্ণ অনৈক্য নাই, অনুরূপতা মাত্র আছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের ভাষার ন্যায় হিব্রু বহিঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তামিল ভাষার সহিত যে সকল ইউরোপীয় সংযোগধর্ম্মী (agglutinative) ভাষার সবিশেষ সম্পর্ক আছে সেই সকল ভাষার কোনও-কোনও-টীতে অর্থাৎ লাপলাণ্ড ও ফিনলাণ্ডের দুইটী ভাষায় এবিষয়ে উচ্চারণ বিষয়ক বিধি সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন পদাদি বা অক্ষরাদিতে (beginning of a syllable) এই দুই ভাষায় (Finnish and Lappish) নাদ বর্ণের ব্যবহার কুত্রাপি নাই। ইরাণ দেশীও বেহিস্তন-লিপিতে শক-ভাষার যে প্রাচীন আদর্শ সংরক্ষিত আছে তাহাতে পদাদিতে কেবলমাত্র শ্বাসবর্ণ ও অন্যত্র কেবলমাত্র নাদবর্ণের ব্যবহার হয় কিন্তু অনাদিবর্ণ দ্বিগুণিত হইলে

তাহার নাদ উচ্চারণ হয় না, শ্বাস উচ্চারণ হয় *। টিউটনিক ভাষায় গ্রীক-কৃত বিধির কোনও কোনও স্থানে অনুরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। যেমন 'দ্বি' বা 'দ্ব' স্থানে 'two', 'দন্ত' স্থানে 'tooth' 'দ্রু' স্থানে 'tree' 'দশন্' স্থানে 'ten' 'ধিত' বা 'হিত' স্থানে deed, শ্রুত স্থানে 'loud' ইত্যাদি। টিউটনিক ভাষার এই বর্ণ পরিবর্ত্তন বা Sound shifting বিধিও অন্য কোনও আর্য্য ভাষায় নাই ; সুতরাং এটীও খাপ-ছাড়া নিয়ম। এ বিষয়ে গ্রীম-ভার্ণার-ব্রুগ্‌মান্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের ঐন্দ্রজালিক বচনকে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবার কাল অতীত হইয়াছে। কোন্ বৈদেশিক ভাষার সংস্পর্শে এ ভাষার এ প্রকার পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে।

প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ পালঘাটনিবাসী শ্রীরামচন্দ্র নায়ার নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত সবিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত ভাষা বেশ জানিতেন এবং অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন ; কিন্তু না-হিন্দি না-ইংরাজী না-বাঙ্গালা কোনও ভাষাই জানিতেন না। অথচ এ অঞ্চলে আসিয়া তিন ভাষাই শিখিতেছিলেন এবং তিন ভাষার মিশ্রণে এবং সময়ে সময়ে সংস্কৃত ভাষারই সাহায্যে ভাব প্রকাশ করিতেন। ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং এ দেশে (দারভাঙ্গা ও কলিকাতায়) ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় শ্রীযুক্তকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট কিয়ৎকাল অধ্যয়ন করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে ইঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই। ইনি বাঙ্গালা বলিবার সময় সংস্কৃতের অনুবাদ চেষ্টায় এ প্রকার অভিনব ভাষার সৃষ্টি করিতেন যে তাহাদের ভাষার প্রকৃতি (morpholgy) ও আমাদের ভাষার শব্দ মিলিয়া এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী প্রস্তুত হইত। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "কামাখ্যানাথ পণ্ডিত কেমন পড়াইতেছেন ?" তিনি তাহার উত্তর দিলেন "পণ্ডিত কামাখ্যানাথ অভিমানী (গর্ব্বিত) আছেন, কিন্তু পঠিবার (পড়িবার) নিমিত্ত সময়ে (অধ্যয়ন দশায়) তাহাতে আমাদের কোনো দোষ (ক্ষতি)

*আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাতেও কোনও কোনও স্থানে এ প্রভাব বর্ত্তিয়াছে। সংস্কৃত 'ব্রজতি' স্থানে প্রা 'বচ্চই', 'গৃহ্লাতি' 'গৃভ্লাতি' স্থানে প্রা 'ঘেপ্পই' 'বদতি', স্থানে 'বোচ্চই', স 'উৎঘোষমান স্থানে পৈশাচী 'উক্‌খোসমান', 'নষ্ট্বা' স্থানে পৈশাচী 'নৎথুন', ইত্যাদি প্রাকৃতে যুক্তবর্ণের একটীর লোপ ও শেষভূতটীর দ্বিত্ব তামিল ভাষার উচ্চারণের অনুরূপ।

নাই।" সংস্কৃত প্রত্যয়ের প্রভাবে এক 'পঠনায়' পদদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায় তাহার জন্য ইনি একটি অতিরিক্ত 'নিমিত্ত' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ ইঁহাদের ভাষা সংযোগধর্ম্মী বা সমাসধর্ম্মী (agglutinative), অর্থাৎ এক একটী শব্দ ইঁহাদের প্রত্যয়ের কার্য্য করে, আবার আবশ্যক হইলে সেই প্রত্যয় স্থানীয় শব্দটীর স্বাধীন ব্যবহারও হইতে পারে। স্বাধীন ব্যবহার সর্ব্বত্র না হইলেও তাহাদের এক একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকে ; সংস্কৃতে তাহা নাই। এই জন্য নিজের ভাষার প্রভাবে প্রত্যয়ের পরে প্রত্যয়ের অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য ইনি অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালা ভাষার রীতির বিরুদ্ধে একটী অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ সংস্কৃত 'পঠ' ধাতু অবিকল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিয়া ফেলিলেন! কারণ 'পঠ' ধাতু স্থানে 'পড়' উচ্চারণ তাঁহার নিজের ভাষাতেই হয় বলিয়া প্রাদেশিকতা পরিহার কল্পে সংস্কৃত উচ্চারণ বজায় রাখা আবশ্যক মনে করিলেন! এই সামান্য উদাহরণ যাহা দেখা গেল সেই ভাবেই দুই দুই ভাষার মিলন ও পরস্পর প্রভাব বিস্তার চলে। সং 'পঠ' উচ্চারণ করিতে আমরা অসমর্থ নহি, কিন্তু তথাপি 'পড়' উচ্চারণ আমাদের সংস্কারের সহিত মিশিয়া গেল কি প্রকারে ? এ সেই অতি প্রাচীন কালের দ্রাবিড়ীয় সম্পর্ক, সেই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বর্ণিত বানরগণের প্রভাব, সেই অগস্ত্যপ্রবর্ত্তিত বিন্ধ্যশৈলের দর্পহরণের ফল স্বরূপ আমাদের ভাষায়, তথা সংস্কৃত ও বেদের ভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব বর্ত্তিয়াছে। নতুবা মীমাংসাচার্য্য জৈমিনি, ভাষ্যকার শবরস্বামী ও টীকাকার কুমারিল ভট্ট বেদে ম্লেচ্ছ শব্দ বা (দ্রাবিড়ীয় শব্দ) দেখিতে পাইতেন না এবং তাহাদের তত্তদ্দেশ প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিতেন না।

আমাদের ট-বর্গের উচ্চারণের জন্যও আমরা দ্রাবিড়ীয়গণের নিকট ঋণী। মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উচ্চারণ আর্য্যভাষায় প্রাচীন নহে। ইংরাজী ভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাসমূহেও এই টবর্গের উচ্চারণ নাই। এমনকি পারস্যের ভাষায় এ উচ্চারণ নাই এবং কোনও কালে ছিল না। ইংলণ্ডের t ও d বর্ণের উচ্চারণ না-দন্ত্য না-মূর্দ্ধণ্য। কিন্তু আমাদের বাগ্‌যন্ত্রে এরূপ উচ্চারণ হয় না এবং আমাদের কাণে ওরূপ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না। সে যাহাই হউক ইংলণ্ডের উচ্চারণ ও বহিঃপ্রভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু এ কথা খাঁটি যে ইংলণ্ডের সহিত আমাদের সম্পর্কের বহু পূর্ব্বেই আমাদের ভাষায় ট-বর্গের উচ্চারণ স্থান পাইয়াছে এবং আমাদের বেদে এই উচ্চারণ আছে। সুতরাং ইংলণ্ডের প্রভাব

এটা নহে। আমি মনে করি এ উচ্চারণ প্রাচীন দ্রাবিড়ীয়ভাষা হইতে প্রাচীন সংস্কৃত বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় সংক্রমিত হইয়াছে। এ ধারণার পক্ষে প্রধান হেতুরূপে নির্দ্দেষ করা যায়:—

(১) তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষার বহু ধাতুতে দন্ত্যবর্ণ ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ভেদ সহ অর্থ ভেদ আছে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের সে প্রকার ব্যবহার হয় নাই। সংস্কৃতে দন্ত্য বর্ণ ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণে (বিশেষত্ব ন ও ণকারে) প্রভেদ কেবলমাত্র স্থিতি জন্য; অর্থ জন্য নহে। ঋ, র, ষ প্রভৃতি বর্ণের পরবর্ত্তী দন্ত নকারই মূর্দ্ধণ্য নকারে পরিণত হয়।

(২) সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট ইউরোপ ও এসিয়ার অন্যান্য আর্য্য-ভাষা সমূহের কোনওটীতেই ট বর্গ নাই। গ্রীক ভাষায় নাই, লাটিন ভাষায় নাই গথিক, কেল্‌টিক, লিথুআলীয় শ্লাবনীয় বা প্রাচীন ও আধুনিক পারস্য ভাষায় নাই। উর্দ্দু ভাষায় ট ড প্রভৃতি লিখিবার জন্য নূতন অক্ষর সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। কেবল ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ীয় ভাষায় ট বর্গ আছে। বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষায় আছে। প্রকৃত ভাষায় ট বর্গীয় বর্ণসমূহের সমধিক ব্যবহার করিয়াছে*।

(৩) সংস্কৃত শব্দ দ্রাবিড়ীয় ভাষায় গৃহীত হইলে তাহার উচ্চারণের সংস্কার বিনাব্যতিরেকে হইয়া থাকে। তামিলভাষিগণ প্রথমে সংস্কৃত শব্দকে তামিলভাষার অনুরূপ উচ্চারণে পরিবর্ত্তিত করিবেন পরে সে শব্দের তামিল ভাষায় ব্যবহার করিবেন। সংস্কৃতের অনুরূপ উচ্চারণ তাঁহারা কোনও কালেই করেন নাই ও করেন না। এজন্য সংস্কৃতের কোনও মহাপ্রাণ বর্ণ তামিল ভাষায় স্থান পায় নাই। এমন কি সংস্কৃত উষ্মবর্ণ মূর্দ্ধণ্য ষ তামিল ভাষায় নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে তামিল ভাষায় ট বর্গের উচ্চারণ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

* বেদের ভাষায় যে মূর্দ্ধণ্য ছিল, পরবর্ত্তী যুগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় তাহার পরিহার হইয়াছে। কিন্তু দ্রাবিড়ীয় ভাষাসমূহে মূর্দ্ধণ্য কারের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে। সংস্কৃত শব্দ কানারিজ্ বা মালয়ালম্ ভাষায় গৃহীত হইলে তাহার মূর্দ্ধণ্য ফুটিয়া উঠিবে—সংস্কৃত শব্দে সে থাকুক আর নাই থাকুক। তামিল ও তেলেগু ভাষায় ণ বর্ণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। মহারাষ্ট্রী ও কঙ্কণী ভাষা আর্য্য ভাষা হইলেও বৈদিক ণ কারের সমাদর বজায় রাখিয়াছে। অথচ আর্য্যাবর্ত্তের অন্য কোনও ভাষা এ ণ উচ্চারণ করিতে হয় অসমর্থ, না হয় অসম্মত।

(৪) তেলেগু ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে সমধিক প্রভাবান্বিত হইলেও তামিল অপেক্ষা তেলেগু ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তামিল ভাষাতেই মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার অধিক।

(৫) বেইস্তনের ফলকলিপিতে যে শকভাষায় প্রাচীন আদর্শ সংগৃহীত আছে তাহাতে ট বর্গীয় বর্ণসমূহের সত্তা দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ফিন্‌লাণ্ড, লাপ্‌লাণ্ড প্রভৃতি স্থানের অনার্য্য শকভাষায় যে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ দৃষ্ট হয় তাহাই বেহিস্তন লিপি ও ব্রাহুই ভাষার মধ্য দিয়া দ্রাবিড়ীয় ভাষায় গিয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে এ উচ্চারণ শকভাষার বৈশিষ্ট্য, এবং শকভাষাসমূহ বা ফিন্‌লাণ্ড লাপলাণ্ড, তুর্কী, হাঙ্গারী, সাইবিরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে যে সমাসধর্ম্মী (agglutinating) ভাষাসমূহ পরিদৃষ্ট হয় দ্রাবিড়ীভাষাও সেই শ্রেণীর ভাষা এবং এই সকল ভাষার সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার সবিশেষ সম্পর্ক আছে। সুতরাং এ উচ্চারণ এই সকল ভাষাতেই মৌলিক ভাবে সমুদ্‌ভূত।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিতদিগের নানা মুনির নানা মত। সুতরাং সেই সকল মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। বেন্‌ফি বলিয়াছেন, "মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ সমূহের উচ্চারণ সম্ভবতঃ ভারতের প্রাচীন অনার্য্য আদিমনিবাসিগণের বর্ণমালা হইতে সংস্কৃতের বর্ণমালায় আসিয়াছে, এবং সংস্কৃতে তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" * বেন্‌ফি সাহেবের এমত নিতান্তই সম্ভাবনামূলক; ইহাতে কোনও বিশেষ যুক্তির অবতারণা হয় নাই। সুতরাং ইহার তেমন মূল্য নাই। বুলর (Buhler) সাহেব যুক্তিসহ প্রতিকূল মত দিয়াছেন। ঋ, র, ও ষ মূর্দ্ধণ্য বর্ণ, এবং ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও ইরাণীয় জেন্দ্ ভাষায় এই তিনটী বর্ণই আছে। ইউরোপীয় ভাষায় ষ না থাকিলেও 'sh' উচ্চারণ আছে। আবার তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ষ নাই। ঋ এবং র আর্য্য ভাষার মৌলিক উচ্চারণ। সংস্কৃত ভাষায় এই ঋ, র বা ষ এর প্রভাবেই মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের উৎপত্তি হয়। সুতরাং বুলর্ বলেন যে সংস্কৃতে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ব্যতিরেকেই স্বাধীন ভাবে ট বর্গীয় উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার মতে সংস্কৃত ও দ্রাবিড়ী উভয় ভাষাতেই স্বাধীনভাবে পৃথক পৃথক কারণে মূর্দ্ধণ্য

* The mute cerebrals have probably been introduced from the phonetic system of the Indian aborigines into Sanskrit, in which, however, they have become firmly established"—Muir's Sanskrit Texts vol II. 466.

স্পর্শবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ে উভয় ভাষাই পরস্পরের প্রভাব নিরপেক্ষ। স্বাধীন সৃষ্টির উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন যে টিউটনিক (বিশেষতঃ ইংরাজী) ও স্লাবনিক ভাষায়ও মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের সত্তা আছে, ব্যাকরণে থাকুক আর নাই থাকুক। উইল্‌সনের সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে তিনি একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া * বলিতে চাহেন যে উইল্‌সন ইংরাজী ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের সত্তা দেখিয়াছেন। সুতরাং বুলরের মতে স্বাধীনভাবে যখন একটী আর্য্য ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তবে অপর আর একটী ভাষায় তাহা না হইবে কেন? তিনি আরও বলেন যে পর-ভাষার উচ্চারণ গ্রহণ করা কোনও ভাষাতেই দেখা যায় নাই এবং সে প্রকার পর প্রভাবের কোনও মতবাদ এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। * সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব স্বীকার করিবার হেতু নাই।

বুলারের কথায় ঋ, র ও ষ বর্ণের প্রভাবে যখন মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উৎপত্তি হয় তখন ইহাকে তিনি অন্য-নিরপেক্ষ উৎপত্তি বলেন কি প্রকারে? দ্রাবিড়ী ভাষায় অন্য নিরপেক্ষ ভাবে এই সকল বর্ণের সত্তা এবং দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভেদে অর্থের প্রভেদ যেরূপভাবে হয়, তাহাতে দ্রাবিড়ী মূর্দ্ধণ্য বর্ণ

* The Sanskrit consonants are generally pronounced as in English, and we have, it may be suspected, several of the sounds of which the Sanskrit alphabet has provided distinct signs. This seems to be the case with the *cerebrals*. We write but one *t* and one *d*, but their sounds differ in such words as *trumpet* and *tongue*, *drain* and *don*, in the first of which they are *cerebrals*, in the second *dentals*.—H. H. Wilson, Sanskrit Grammar, p 3.

* The possibility of borrowing of sounds by one language from another has never as yet been proved. * *. Comparative philologists have admitted loan-Theories too easily, without examining facts. * * *. Regarding the borrowing of sounds it may suffice for the present to remark that it has never been shown to occur in the languages which were influenced by others in historical times, such as English, Spanish and the other Romance languages, Persian, etc. * * * We find still stronger evidence against the loan-theory in the well-known fact that nations which, like the Jews, the Parsees, the Slavonian tribes of Germany, the Irish, etc. have lost their mother-tongue, are, as nations, unable to adopt with the words and grammatical laws also the pronunciation of the foreign language.—Madras Journal of Literature 1864, pp 116-136, in an article contributed by Dr. Buhler.

স্বাধীনভাবে উদ্ভূত, অথবা সংস্কৃত অপেক্ষা অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড়ী ভাষায় প্রচলিত এ কথা স্বীকার করিতে হয় বটে, কিন্তু যে ভাষায় এই উচ্চারণ সাধারণতঃ এই উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট অন্য বর্ণের সম্পর্কে জাত হয়, তাহাকে অন্য নিরপেক্ষ বলা যায় না! যে উচ্চারণ তোমার পরিচিত সেই উচ্চারণের সহায়তাতেই অপরিচিত উচ্চারণ লক্ষিত করা সম্ভব-পর। তাই সংস্কৃতে ঋকারাদি বর্ণের সাহচর্য্যে এবং ইংরাজী trumpet, drain প্রভৃতি শব্দেরও ণ বর্ণের সম্পর্কে মূর্দ্ধণ্য স্পর্শ বর্ণ লক্ষিত করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কোণ, কুণি, গণ, গুণ, পণ, পণ্য, বণিক্, প্রভৃতি বহু শব্দে স্বাধীন মূর্দ্ধণ্য ণ (ব্যাকরণের স্বাভাবিক ণ) দৃষ্ট হয়। কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় র বর্ণের তিন প্রকার উচ্চারণ ও ল বর্ণের দ্বিবিধ উচ্চারণ এবং যাবতীয় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের স্বাধীন উচ্চারণ (অবশ্য মহাপ্রাণ বর্ণ বা উষ্ম বর্ণ নাই), প্রভৃতি কারণে এবং অতি দূরদেশবর্ত্তী ভাষা সমূহের সহিত দ্রাবিড়ী ভাষার সম্পর্ক এবং সে সকল ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণের সত্তা প্রভৃতি কারণে বলিতে হয় যে দ্রাবিড়ী ভাষায় বা যে ভাষা হইতে দ্রাবিড়ী ভাষা সমুদ্ভূত সেই প্রাচীন ভাষায় মূর্দ্ধণ্য বর্ণে উচ্চারণ অতি প্রাচীন; এবং বহু-কাল একত্র নিবাস হেতু সংস্কৃত ভাষায় এ উচ্চারণ সংক্রমিত হইয়াছে!

তামিল ভাষায় দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের প্রভেদ-প্রদর্শক কয়েকটী শব্দ :—

কুদি = উল্লম্ফন	কোত্তু = খনন করা
কুড়ি = পানকরা	কোট্টু = ঢাক বাজান
পুদৈই = আচ্ছাদন বা গোপন করা	অরি = চর্ব্বণ করা
পুড়ৈই = সরা অপসরণ	অর্‌ি = জানা
	অরি = বিনাশ করা
এন্ = বলা	অরু = বিরল হওয়া
এণ্ = গণা	অর্‌ু = কাটিয়া ফেলা
	অরু = অশ্রুত্যাগ করা, রোদন করা
মনৈই = গৃহ	কোল্ = হত্যা করা
মণৈই = বিষ্ঠা	কোণ্ গ্রহণ করা
কত্তু = শব্দ করা	তুলৈই = শেষ করা
কট্টু = বাঁধা	তুণৈই = ছিদ্র করা *

* Caldwell's Comparative Grammar of the Dravidian Languages, 2nd Edition, 1875, pp 37-38.

ইংরাজী ভাষায় মূর্দ্ধণ্য স্পর্শ বর্ণের অন্য-নিরপেক্ষ ব্যুৎপত্তির কথা যাহা বুলর বলিয়াছেন তাহার উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে অন্য-নিরপেক্ষ নহে। টিউনিক ভাষায় গ্রীমের আবিষ্কৃত ঐন্দ্রজালিক ধ্বনি পরিবর্ত্তনের বিধির ন্যায় এস্থলেও প্রকৃত কারণ নির্ণয় বিষয়ে অনুসন্ধান আবশ্যক। লাপলাণ্ডের ভাষা হইতে স্কান্দিনেবিয়ার মধ্য দিয়া নর্মানগণ তাহাদের এ উচ্চারণ পাইয়াছে কিনা কে জানে? 'ইংরাজী উচ্চারণ যে দক্ষিণ-ইউরোপের উচ্চারণ হইতে (এমন কি ফরাসী ও জর্ম্মণ হইতে) বিভিন্ন এবং ভারতবর্ষের দন্ত্য বর্ণ অপেক্ষা মূর্দ্ধণ্য বর্ণের অধিক সন্নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। r-বর্ণ পূর্ব্বে থাকিলে t, d বা n বর্ণের সম্পূর্ণ মূর্দ্ধণ্যতা প্রাপ্তি ঘটে। যেমন mart, yard, barn : এই সকল স্থলে মূর্দ্ধ্যতা trumpet ও drain অপেক্ষা অধিক। ণ-বর্ণের সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক ইংরাজী t ও d বর্ণের উচ্চারণ আমাদের নিকট মূর্দ্ধণ্য। Director শব্দ বাঙ্গালা অক্ষরে হইবে 'ডিরেক্‌টর' ('দিরেক্‌তর' নহে)।

আর একটা কথা উঠিয়াছে, উচ্চারণ বিষয়ে কোনও ভাষায় পরপ্রভাব প্রমাণিত হয় নাই। বুলরের সে যুগে এটা অপ্রমাণিত থাকিলেও এ যুগে প্রমাণিত হইয়াছে। পৃথিবীর অনেক জাতিই অন্য জাতির ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। এলাহাবাদ প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্তান হিন্দু, উর্দু ও বাঙ্গলা সমভাবে শিখে এবং তিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়। কল্ড্‌ওয়েল (Bishop Caldwell) বুলরের কথার একটু ঘুরাইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। বুলর বলেন ইংরাজী ভাষায় নর্মানদিগের আগমনের পর নর্মান প্রভাবে ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী সাক্‌সানদিগের ভাষায় শব্দসম্পদ ও প্রত্যয়াদি বিষয়ে ভূয়ান্ পরিবর্ত্তন হওয়াসত্ত্বেও উচ্চারণ-গত কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং সাক্‌সানেরা ফরাসী a বা u উচ্চারণ করিতেও শিখে নাই। ইহা হইতেই বুলার প্রমাণ করিতে চাহেন যে উচ্চারণ প্রণালী এক ভাষা হইতে ভাষান্তরে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু তিনি একথা ভুলিয়া গেলেন যে নর্মানেরা সাকসানদিকের উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছে। স্কান্দিনেবিয়া বা উত্তর দেশ হইতে আসিয়া নর্মানেরা (Northmen) ফ্রান্সে দুই শতাব্দীমাত্র বাস করিয়া ফরাসী উচ্চারণ গ্রহণ করে এবং তাহার পরে ইংলণ্ডে যাইয়া আবার সেখানকার উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়। ইহা অপেক্ষা পর প্রভাবের উজ্জ্বল উদাহরণ আর কি হইতে পারে? বুলরের যুক্তি গ্রহণ করিলে তাঁহারই কথায় তাঁহাকে বলা যায় যে যেমন করিয়া নর্মানেরা ইংলণ্ডে আসিয়া সাকসানদিগের উচ্চারণ প্রণালী

গ্রহণ করে, সেই প্রকারেই আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়ীয় উচ্চারণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। Caldwell আফ্রিকার ভাষা হইতে পরপ্রভাবের আরও অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। আমরা বাহুল্য ভয়ে তাহার অবতারণা করিলাম না।

গৌড়ীয় ভাষাসমূহের ব্যাকরণ লেখক বিম্‌স্ এ বিষয়ে একটী অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়া বুলরের মতের প্রায় সমর্থন করিয়াছেন। তিনি জলবায়ুর প্রভাবে উচ্চারণ প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া ভারতবর্ষে অন্তনিরপেক্ষভাবে সংস্কৃতভাষায় ট বর্গের উচ্চারণ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া দীর্ঘ বিচার করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের একালপর্য্যন্ত যে চর্চ্চা হইয়াছে তাহাতে ভাষা বা উচ্চারণের উপর জলবায়ুর প্রভাব স্বীকৃত হয় নাই। তবে এ বিষয়ে আলোচনাও নিরস্ত হয় নাই। কিন্তু একথা খাঁটি সত্য যে ভারতে আর্য্য ও দ্রাবিড় উভয় জাতিই দন্ত্য ও মূর্দ্ধণ্য স্পর্শবর্ণ সমূহের সমভাবে উচ্চারণ করিতে সমর্থ। জলবায়ুর কোনও প্রভাব এদেশে স্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। বাগ্‌যন্ত্রের গঠনপ্রণালীগত কোনও বিশেষ প্রভেদ আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতির মধ্যে নাই।

অতঃপর উষ্মবর্ণের কথা। তামিল ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ষকারের উচ্চারণ নাই একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দন্ত্য সকার ও ইহাদের ভাষায় নাই। চ বা তালব্য শ লিখিবার একমাত্র অক্ষর। ইহার দ্বিত্ব হইলে 'চ্চ' হয়, একক থাকিলে 'শ' হয়। সংস্কৃতের প্রভাবে এক্ষণে শ, ষ ও স তিন বর্ণই দ্রাবিড়ী ভাষায় স্থান পাইতেছে এবং 'গ্রন্থ' অক্ষর ব্যবহৃত হইতেছে।

আর্য্যভাষাসমূহের উচ্চারণের ক্রমভেদে দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে; —কেন্টুম (Centum) ভাষাসমূহ ও শতেম্ (Satem) ভাষাসমূহ। এই দুই শ্রেণীর প্রথমগুলিতে মৌলিক তালব্য ক (*K) বর্ণের 'ক' উচ্চারণ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'শ' উচ্চারণ হয়। এ উচ্চারণের বিভিন্নতার কারণ নির্ণয় চেষ্টা হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু কারণ নির্ণয় চেষ্টা করিলে তাহা যে ফল প্রসব করিতে পারে না ইহা মনে করি না। কারণ যে সকল ভাষায় শ উচ্চারণ দেখা যায়, সেই সকল ভাষা শক ভাষাসমূহের নিকটবর্ত্তী। এবং কেবলমাত্র নবাবিষ্কৃত তুখারীয় (Tokharian) ভাষা ভিন্ন অন্য যে সকল ভাষায় 'ক' উচ্চারণ হয়, সে সকল ভাষা শক ভাষাসমূহ হইতে বহু দূরবর্ত্তী। আমার মনে হয় যে মূল ভাষা হইতে দ্রাবিড়ী ভাষা সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই ভাষাতে এই

উচ্চারণ ছিল এবং সেই জন্যই তামিল ভাষায় এ উচ্চারণ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 'শতম্' ইরাণীয় জেন্দ্ ভাষায় 'satom' (শতম্), লিথো শ্লাবনীয় 'szimtas' প্রভৃতি 'শ' বা উষ্ম বর্ণের উচ্চারণ এবং গ্রীক '(he) katon' (হেকাটোন্), লাটিন 'Centum' (কেন্টুম্), কেল্টিক cet (from 'Kent') গথিক 'hund' (এখানে 'ক' স্থানে 'খ' বা 'হ' হইয়াছে, Grimm's Law) তুখারীয় 'Kandh' প্রভৃতিতে 'ক' উচ্চারণ হইয়া থাকে। সংস্কৃত 'দশন্' (=১০), জেন্দ্ 'দশ', আর্মিনীয় 'tasn', গ্রীক 'deka', লাটিন 'decem' ('dekem'), প্রাচীন আইরিশ্ dech ইত্যাদি। এই সকল ভাষায় 'ক' ও 'শ' উচ্চারণ যে গোলযোগ দেখা যায় দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহেও তাহা লক্ষিত হয়। কানারিজ 'কিন্ন' (=ক্ষুদ্র) স্থানে তামিল 'শিন্ন' কানারিজ 'কিবি' (শ্রবণেন্দ্রিয়) স্থানে তামিল 'শেবি' কানারিজ 'গেয়্' ('কেই', করা) স্থানে তামিল 'শেয়্'।

সংস্কৃত 'অম্ল' স্থানে বাঙ্গালায় 'অম্বল' উচ্চারণ করিয়া আমরা উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ একটী অতিরিক্ত 'ব' আনিয়া ফেলি, তামিল ভাষায় উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থ অনুনাসিক বর্ণের সহিত এই প্রকার সহায়ক বর্ণের উচ্চারণ বিরল নহে। সংস্কৃত 'গোধূম' শব্দের তামিল উচ্চারণ 'কোদুম্বৈ'। এ উচ্চারণকে ভাষাবিশেষের সম্পত্তি বলা যায় না, কারণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষিত হয়। সংস্কৃত 'স্বনঃ', লাটিন 'sonus' ইংরাজীতে sound কিন্তু দ্রাবিড়ী ভাষায় সময়ে সময়ে এই উচ্চারণের একমাত্র অতি-পরিণতি দেখা যায়; এ স্থানে সময়ে সময়ে অনুনাসিক অংশ লোপ পাইয়া 'ম' স্থানে 'ব' হয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশের স্থান বিশেষে 'নামা' স্থানে 'নাবা', 'তামা' স্থানে 'তাঁবা', 'আম' স্থানে 'আঁব' প্রভৃতির উচ্চারণের নিন্দা করিয়া অন্য স্থানের অধিবাসীরা অনেক সময় 'মামা' শব্দের 'ম' স্থানে 'ব' উচ্চারণ করিলে যে অর্থ বিকৃতি ঘটে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানিয়া রাখুন তামিল ভাষার 'মামন্' (='মামা') এবং 'মামি' (=মামী) শব্দের 'ম' স্থানে কুর্গী ভাষায় 'ব' হয়; তবে উভয়ত্র নহে, প্রথম মকার ঠিক থাকে। তামিল 'মামন্' (=শ্বশুর)=কুর্গী 'মাবু', তামিল 'মামি' (=শ্বশ্রূ)=কুর্গী 'মাবি'। তামিল ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় এবং প্রাদেশিক তামিল ভাষায় এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

স্থানে স্থানে অনুনাসিকের লোপ করা যেমন দ্রাবিড়ী ভাষার একটী লক্ষণ, স্থানে স্থানে অতিরিক্ত অনুনাসিকতাও এ ভাষার সেইরূপ একটী বৈশিষ্ট্য। তামিল ভাষায় ইহার অসংখ্য উদাহরণ—'কু' (বা 'গু') প্রত্যয় যোগে—

অড়ু গু=অড়ঙ্গু। সংস্কৃত 'শুনকঃ' (=কুকুর) তামিল ভাষায় হয় 'শুণঙ্গন্' ও 'শোণঙ্গি'। আ+ডু=আণ্ডু (=সেখানে, সে সময়ে)। অ×গু=অঙ্গু (=সেখানে)। 'পণ্ড' স্থানে 'পঙ্গু' (=অংশ, ভাগ) উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। আমাদের ভাষায়ও এই প্রকার অতিরিক্ত অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ বিরল নহে। উদাহরণ ঘোটক—ঘোঁড়া; অক্ষি—আঁখি; কক্ষ—কাঁখ; কাচ—কাঁচ; বাস—বাঁসা; কোরক—কুঁড়ি, কোঁড়া; ইষ্টক—ইঁট; স্ফোটক—ফোঁড়া; উচ্চ—উঁচু, শঙ্খ—শাঁস; বক্র—বাঁকা। পালি ও প্রাকৃত ভাষাতেই এ উচ্চারণ আরম্ভ হইয়াছে। ইরাণীয় জেন্দ্ ভাষায়ও এই প্রকারের একটা দেখা যায়, তাহাতে অনাদি দন্ত্য 'স' বর্ণের হকারে পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে একটা অতিরিক্ত অনুণাসিক বর্ণের আমদানি হয়। উদাহরণ—নাসত্য—নাওং হইথ্য, বস্নু-বংহু; শফাসঃ (বৈদিক)—শফাওংহো; বসনম্—বংহনেম্ (vanhanem), অবসঃ—অবংহো; ইত্যাদি। সর্ব্বত্র কিন্তু এ নিয়ম খাটে না; অসুর—অহুর; ভরসি—বরহি। *

দুইটী স্বরবর্ণ একই পদের মধ্যে একত্র থাকিবার বাধা না থাকিলেও দ্রাবিড়ী ভাষায় স্বরদ্বয়ের মধ্যে 'য', 'ব', 'ন', বা 'ম' এই চারিটী বর্ণের কোনও একটীর ব্যবহার হইয়া থাকে। পালি ভাষায়ও এ নিয়ম আছে। * তামিল ভাষায় তালব্য স্বরের পর 'য়্' ও অন্য স্বরের পর 'ব' হয়। বর+ইল্লৈ—বরবিল্লৈ (আসে নাই, অনাগত, not come), বরি+অল্ল—বরিয়ল্ল (রাস্তা নহে, (it is not the way), অন্যান্য বর্ণের আগম এ ভাষায় নাই। সুতরাং অন্যান্য দ্রাবিড়ী ভাষার কথা এখানে আলোচ্য নহে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও আমরা অনুরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি। আমাদের 'হ' ধাতুর পর 'আ' প্রত্যয়

---

* ১৩১৯ সালের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ২য় খণ্ডে বঙ্গভাষার অনুনাসিকতা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তখন তামিল ভাষার এ বৈশিষ্ট্য জানিতাম না।

* "যবমদন তরলা চাগমা। কচ্চায়ন ১।৪।৬। সরে পরে যকারো বকারো মকারো দকারো নকারো তকারো রকারো লকারো ইমা আগমা হোন্তি।" উদাহরণ যথা×ইদং=যথয়িদং, তত্তা×উদিক্খতি=তত্তাবুদিক্খতি, লহু×এসতি=লহুমেস্মতি, সম্ম+অঞ্ঞা=সম্মদঞ্ঞা, ইতো আয়াতি=ইতোনায়াতি, যস্মা+ইহ—যস্মাতিহ, আরগ্গে×ইব=আরগ্গোরিব, ছ+আয়তনং—ছলায়তনং। সংস্কৃতেও এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উদাহরণ—সখ আগচ্ছ, সখয়াগচ্ছ; প্রভ এহি, প্রভবেহি; শ্রিয়া অর্থঃ, শ্রিয়ার্থঃ; রবা অস্তমিতে, রব্বাবস্তমিতে; অ ঐক্য=অনৈক্য।

করিলে উভয় স্বরের মধ্যে বকারাগম হয় না বটে, কিন্তু বকারের উচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণ ওকার দ্বারা লক্ষিত হয়, যেমন 'হওআ' বা 'হওয়া'। প্রাকৃত 'ইঅ' প্রত্যয় বাঙ্গালায় 'ইয়া' হয়, যেমন 'করিয়া', 'যাইয়া'। প্রাকৃত ভাষাতেও এ উচ্চারণ দেখা যায় এবং জৈন-প্রাকৃত বা জৈন ধর্ম্মগ্রন্থাদির ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী 'য়' উচ্চারণ 'য-শ্রুতি' নামে পরিচিত। নেতিবাচক 'অ' উপসর্গ ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে ইহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না বটে, কিন্তু স্বরবর্ণের পূর্ব্বে বাঁধ দিবার জন্য একটা নকারকে ডাকিয়া আনে। এইরূপ নকারের উচ্চারণ সংস্কৃত, জেন্দ ও গ্রীক ভাষায় হইত। অন্যান্য আর্য্য ভাষায় নকারের লোপ হইত না। এই লইয়া Bragmann এর বিখ্যাত Sonant nasal theory.

যতই আলোচনা করা যায় ততই এ বিষয়ে আলোচনার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায় অথচ প্রবন্ধের কলেবর বিপুল হইয়াছে। সুতরাং আমরা বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

যুগ-পথ।

[শ্রীভোলানাথ সাহা]

মহা মিলনের মন্ত্রসাধন উৎসবে
আজ্ জুট সবে—
ল'য়ে প্রাণের বিপুল বেদনায় ভরা আঁখি,
সয়ে সব জ্বালা সব কর্ম্মের মাঝে থাকি,
শোন্ সঙ্গীত,
দেখ্ ইঙ্গিত
করে রক্তিম রোষে শক্তিময়ী যে "স'রে যা ভণ্ড, কুট সবে,
আয় সরল, প্রেমিক সাধকেরা আয় আমার প্রসাদ লুট সবে।"
এযে শান্তি যুদ্ধ—
চিত্ত শুদ্ধ—
ধর্ম্মের প্রসারণ ;
এযে 'মা' ব'লে ডাকা, বুক পেতে থাকা, অন্যথা অকারণ।

এযে জ্ঞানের সাগরে হাবুডুবু, শিরে শান্তির বারি ল'য়ে ;
এযে অকূলের কোনে আলোকের আভা এতকাল র'য়ে র'য়ে।
ওরে যুগের প্রভায় আজ্
প্রভাময় হ'য়ে ভারত আজিকে পরিয়াছে শিরে তাজ—
বোবা, কালা যত শোনে, কথাকয়।
কাণা, খোঁড়া যত দেখে খাড়া র'য়।
অভাবুক যত হয় ভাবময়
স্বাধীনের পরে সাজ।
বাঙ্গে পরাধীন হ'য়ে প'ড়ে থাকা বুকে বাজের অধিক লাজ।
ওই, দূর হ'তে ডাকে কে ?
অমৃতের বাণী গুরুগম্ভীরে কর্ণে পশিল রে।
শোন্ শোন্ ওই শোন্,
এখনো ধ্বনিছে শোন্—
জননীর খাসা প্রাণময়ী ভাষা এখনো ধ্বনিছে শোন্—
"সৃষ্টির সেরা মানব যে তুমি ছাড় সৈনিক-সাজ,
শক্তি আজি যে সাধনার পথে, হত্যা নহে তো কাজ।"
প্রাণ খুঁজে নে রে ওরে মহাপ্রাণ,
ছাড়্ড়ে হিংসা, রাখ্রে কৃপাণ,
হৃদয়ের বলে হ'রে আগুয়ান্—অদম্য, নির্ভয় ;
সত্যের গূঢ় শক্তির বলে সয়তানে কর জয়।
যে কহে—"অস্ত্র আন্,
ভায়ের বক্ষে হান্"—
মিত্র সে নহে, মান্য সে নহে, হোক শত বলবান্।
নর-আত্মায় গড়িতে যে চায় পশুর অধম করি,
আপন স্বার্থে অন্যের প্রাণ পাপে দিতে চায় ভরি,
তার উপদেশ না করি পরখ্
দু'হাতে বিলায়ে মৃত্যু, মড়ক
বরি ল'বে কি অনন্ত নরক পরকালে তার ফলে ?
অমর আত্মা মরণের বর মাগিবে যে পলে পলে ?
তুই কেন র'বি দূরে ?

আজি মার বন্দনা এ মহাজাতিরে মিলাইল একসুরে।
ক্ষুধা নাই, তবু অছিলায় তার
বিষপান ক'রে নিস্ জ্ঞান ক্ষার ?
অন্তরে দেখ্ আছে অভয়ার বরাভয় রূপ জুড়ে ;
(তুই) রুগ্ন মনের দুষ্ট ক্ষুধায় যাস্ শুধু জ্বলে পুড়ে।
ওরে সন্তান ! আজ সব তান ধর্।
এক তান কর্
সব তানে,
ছাড্ ভাণ, তোর যাক্ প্রাণ তবু
চল্ মহাবল—
সন্ধানে।
ভগবান্ ! আজি ভক্তির মাঝে শক্তি বিতর মন্-প্রাণে,
ভাষা দাও যাতে ভেসে যায় দেশ,
ভাব দাও যাতে ভেবে পায় শেষ,
জ্বালা দাও যাতে জ্বলে মোহ, দ্বেষ—
সবে কয়—"এই পন্থা নে"—
তব 'পাঞ্চজন্য' মিলায় সিদ্ধি ত্রিংশ কোটি সন্তানে।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাষা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

ভাষা কি—ভাষার উৎপত্তি—ভাষা ও জাতি

পরস্পরের মনোগতভাব বিনিময় করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় মানুষ অবলম্বন করে তাহাকেই ভাষা বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত প্রবর টাইলর বলিয়াছেন—উচ্চারিত ধ্বনিবিশেষের সহিত সাধারণত সংশ্লিষ্ট ভাবের প্রকাশ ক্রিয়া ভাষা দ্বারা সাধিত হয় (the expression of ideal by means of

articulate sounds habitually allotted to those ideas)। ভাষা উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়, কিন্তু সমস্ত উচ্চারিত ধ্বনিই ভাষা নয়—কারণ তাহার ভিতর ভাব না থাকিতেও পারে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্কেত, চিত্র, গ্রন্থিযুক্ত রশি কিম্বা নানারূপ রঙ্ অথবা অন্যান্য অনেক প্রকারে কৌশল ব্যাপকভাবে ভাষা কাজ করে বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

হাত, চোখ, মুখ প্রভৃতি অঙ্গের দ্বারা আমরা অনেক সময় অনেক ভাব প্রকাশ করি। ভিন্ন ভাষা ভাষী দুইজন লোকের প্রথম ভাব বিনিময়ের চেষ্টায় এই জাতীয় সঙ্কেতের বাহুল্য দেখা যায়। মিশর প্রভৃতি দেশে চিত্রের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হইতে—ক্রমে এই—সমস্ত চিত্র হইতে বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। চীনদেশে একটি ভাববাচক একটি চিত্র বা তাহার অংশ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন মেক্সিকো দেশে গ্রন্থিযুক্ত রশি দ্বারা সংবাদাদি পাঠানো হইত। এখনো সৈন্য বিভাগে Signalling সঙ্কেতের দ্বারা অনেক কাজ করা হয়।

এইরূপ ভাব বিনিময়ের নানা প্রকার উপায়ের মধ্যে ধ্বনি দ্বারা ভাব বিনিময় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া মানুষের ভাষার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। আদিম মানবের পক্ষে দূর হইতে শব্দ করিয়া সঙ্কেত করা প্রশস্ত উপায় ছিল—দৃষ্টির আড়ালে থাকিলেও এই সঙ্কেত সম্ভবপর হইত এবং দূরত্ব বা অন্ধকার ইহাতে কোনও বাধার কারণ হইত না।

ভাষার উৎপত্তি কি প্রকারে হইল তাহা ঠিক করা এক প্রকার অসম্ভব। নানা মুনির নানা মত এ বিষয়ে চলিয়াছে। কোনটাই ঠিক নহে, অথচ সকল গুলিই কতক কতক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করে। বেদে এবং বাইবেলে ভাষায় দৈবী উৎপত্তি (Divine origin) সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পণ্ডিত প্রবর যেস্পার্সেন্ (Jesprsen) বলেন— আদিমানব প্রেমের নৃত্যগীত করিতে করিতে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। গানের সুরের মধ্য দিয়াই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে—এবং শব্দগুলি ক্রমশ বিভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আচার্য্য ম্যাক্সমূলর কতকগুলি মজার থিওরি করিয়াছেন। ইংরেজীতে এইগুলির নাম দিয়াছেন—Bow-wow. Pooh pooh. ding dong, ye-ho-ho। আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর bow wow theory বাঙ্গলা করিয়াছেন—"ভেউ ভেউ" বাদ। অন্যান্য তিনটি থিওরির নাম আমরা যথা ক্রমে থুথু, ঢংঢং এবং হেঁইয়ো হেঁইয়ো বাদ দিব। ভেউ ভেউ বাদের দ্বারা কতকগুলি শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় যেমন— ম্যাও (বিড়াল), ঝুম ঝুমি (এক প্রকার

খেলনা) ঘুঘু ,(অনুরূপ শব্দকারী পক্ষী বিশেষ) ইত্যাদি। থুথু বাদের উদাহরণ— ছ্যা ছ্যা, ফ্যা ফ্যা, ইত্যাদি।

ঢং ঢং বাদের উদাহরণ ঃ—টগ্ বগ্, টক্ টক্ টক্, আঁকা বাঁকা ইত্যাদি—

হেঁইয়ো হেঁইয়ো বাদের উদাহরণ ঃ— পাল্কী বেয়ারার হুঁহুঁ ইত্যাদি

ভেউ ভেউ ও ঢংঢং বাদের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে প্রথমটিতে শব্দ অনুসারে নামকরণ হয়, এবং দ্বিতীয়টিতে শব্দ হইতে ভাবের ধারণা মনে আসিয়া পড়ে। ঝুম্ ঝুম্ শব্দ করে বলিয়া খেল্না বিশেষের নাম ঝুমঝুমি হইল, আর টগ্ বগ্ কথাটি কোনও জিনিসের নাম হইল না বটে কিন্তু ভাত প্রভৃতি ফুটিলে কিরূপ শব্দ হয় তাহার একটা ধারণা কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে আনিয়া দিল।

ম্যাক্সমূলের এই সব থিওরি এখন বিশেষজ্ঞগণ হাসিয়া উড়াইয়া দেন। য়েস্পার্সেন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রোমানেসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে মানুষের ভাষা সৃষ্ট হইবার ঢের পরে কুকুর মানুষের পোষ মানিয়াছিল। কুকুর ভেউ ভেউ করিত বলিয়া তাহার নাম "bow wow" হইল ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা নয়। যাহা হউক এই কয়েকটি থিওরি হইতে ভাষার গোটা কয়েক মাত্র শব্দের উৎপত্তি নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট রাশি রাশি শব্দ কোথা হইতে আসিল; ভাষা বিজ্ঞান এখনও ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। পণ্ডিতগণ কেবল মাথা ঘামাইয়া রাশি রাশি থিওরি আওড়াইতেছেন মাত্র। এ মূল তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে কিনা কে জানে।

ভাষা এবং জাতির কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে একজাতি হইলেই এক ভাষা হইবেই আর এক ভাষা হইলেই এক জাতি হইবে। ইহার কোনটাই সত্য নয়। জন্মের সহিত যেমন কেহ লিখিতে পড়িতে শিখে না, সেইরূপ ভাষাও শিখে না। ভাষাকেও চর্চ্চা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। বাঙালীর ছেলে যে একজন ইংরেজের ছেলের চেয়ে সহজে বাঙলা শিখিবে এমন নয়। অবশ্য পারিপার্শ্বিক উভয় ক্ষেত্রেই সমান অবস্থার হওয়া চাই। যদি ছেলেটিকে একবারে নির্জ্জনে রাখা যায় সে কিছুই শিখিবে না।

তবে জাতির চিন্তা করিবার ধরণের সঙ্গে ভাষার কিছু সম্বন্ধ আছে। এবং এই সম্বন্ধটা সহজে যায় না। যখন এক জাতি অপর একজাতির ভাষা গ্রহণ করে তখন তাহার চিন্তাপদ্ধতি অনুযায়ী সে ভাষাকে খানিকটা বদলাইয়া লয়।

আমেরিকার নিগ্রোরা তাহাদের ইংরেজীকে নিজেদের ভাবাপন্ন করিয়া

লইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত যাবতীয় প্রচলিত ভাষাগুলির বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির (syntax) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

ভাষার সমস্ত শব্দ বদ্লাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভাগবত এই কাটামোখানা সহজে বদলায় না। আধুনিক পারস্য ভাষার শব্দ সমূহ অধিকাংশই আরবী হইতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহা মূলত আর্য্যভাষার ভাবিবার ধরণ বজায় রাখিয়াছে এবং আরব্য প্রভৃতি সেমেটীক ভাষা হইতে আর্য্যভাষার বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির যে প্রভেদ তাহা কতকটা ধরিয়া রাখিয়াছে। ভাষার জাতি বিভাগের সময় এই ভাবগত সাদৃশ্যই প্রধান লক্ষণ।

কুচবিহারের কোচেরা তিব্বতি মঙ্গোলীয় নামক মানবজাতির শাখাবিশেষের বংশধর। কিন্তু তাহারা আর্য্যভাষা বাঙ্লাকে কথিত ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে। রক্তের সংমিশ্রণের সঙ্গে ভাষার সংমিশ্রণ খুবই চলিয়াছে। তবে মূল ধাতটি দেখিয়া ভাষার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। রক্তের সহিত ভাষার কোনও সম্বন্ধ নাই। আয়র্লণ্ডের লোকেরা সকলেই প্রায় ইংরেজী বলে—তাহারা এবং ইংরেজরা জাতি হিসাবে পৃথক—ইংরেজরা Anglo saxon, আইরিসরা Celtic কেল্টিক। এখন আবার আয়র্লণ্ডের প্রাচীন জাতীয় ভাষার পুনরুদ্ধারের খুব চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপে ভাষা বদল হয়। সুতরাং জাতি এবং ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিছুই নাই।

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৩৪)

মধু যতটা বলিল ততটা না হইলেও রাখুর ভাগ্যে কর্ত্তামশায়ের তিরস্কারটা বড় কম হয় নাই।

নির্ম্মলার নিকট হইতে কাপড় ও ছাতি লইয়া প্রথমে সে অপরাপর যজমানদের বাড়ী পূজা সারিতে চলিয়া গেল। নির্ম্মলাদেবীর নিমন্ত্রণে যখন সে না বলিতে পারিল না, তখন সে স্থির করিল সব কাজ শেষ করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে যাইবে এবং পূজাশেষে ঠাকুরের ভোগ দিয়া নিমন্ত্রণ সারিয়া

বাসায় ফিরিবে। সেখানে কর্ত্তা মশাইকে ঠাকুরপূজার জন্য অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া সে কলিকাতা, বোধ হয়, চিরদিনের জন্যই ত্যাগের সংকল্প করিল। সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও, রাখুচারু চারুরাখু এই ভাবটা এমন একটা উন্মত্ত করা ছায়াভাবে তাহাকে অভিভূত করিয়াছে যে, দেশে ফিরিয়া কিছুকাল নির্জ্জনে চক্ষুজল না ফেলিতে পারিলে সে যেন পূর্ব্বরাত্রির সেই স্বপ্নকথা স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিবে না। কলিকাতায় থাকিলে তাহার পা দু'টা হয়ত কোনদিন তাহার অন্যমনস্কতায় তাহাকে চারুর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আবার যাইলে আর কি সে পূর্ব্বরাত্রির সে-জীবনের সেই অভিনব-আস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে? চারুর সে সজল বিলোল দৃষ্টির ভিতর দিয়া তার সেই কিন্নরকণ্ঠের ঝঙ্কৃত মধুগীতির আবেদন—আনন্দের পূর্ণভারে আর কি তার সমস্ত হৃদয়টাকে একটা অপূর্ব্ব উল্লাসকর পীড়নে চাপিয়া ধরিবে! তার প্রাণটা কেবল বলিতেছে চারুরাখু হো'ক। কিন্তু তা হওয়ার সম্ভাবনা সে যে কল্পনার কোনও দিক দিয়া অনুমান করিতে পারিতেছে না! রাখু চারু হো'ক একথা কিন্তু মনের একটা কোণ হইতেও সে উচ্চারিত করিতে পারিল না। গৃহস্থ কন্যা বিশেষতঃ বন্য পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলবধূ এমন হীনব্যবসায় অবলম্বন করিতে কেমন করিয়া এই এতবড় জনাকীর্ণ সহরের ভিতরে আসিবে? যদিই বা এ অসম্ভব সম্ভব হয়, তা সেটা তার স্বামীর কি অপরাধে হইবে? রাখুচারু একথা মনে মনে উচ্চারণ করিতে গিয়াও মৃত্যু নিজে আসিয়া যেন তার গলাটা চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিল।

সে স্থির করিল, পূজাকার্য্যে ইস্তফা দিয়া, শুধু সে দেশে ফিরিবে না, ফিরিয়া বিবাহ করিবে। সে দরিদ্র হইলেও বড় কুলীন। তাহাকে ঘর জামাই করিবার জন্য ইহার পূর্ব্বে অনেক স্থান হইতে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল---সে রাজী হয় নাই। সে পল্লীগ্রামে বসিয়া বসিয়া অনেক ঘর জামায়ের দুর্দ্দশা দেখিয়াছিল। শুধু তাই নয়, ঘর জামায়ের পুত্র হওয়ায় যে কি লাঞ্ছনা মামীর নিকট হইতে ব্যবহার পাইয়া সে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। সেই জন্য এতকাল সে বিবাহ করে নাই, গান বাজনার চর্চ্চায় এতকাল মনটাকে সংসার হইতে সে উদাস করিয়া রাখিয়াছিল।

এতদিন পরে আবার তাহার বিবাহে ইচ্ছা হইল। বিবাহের ফল যাই হ'ক, না করিলে চারুর স্মৃতিযন্ত্রণার দায় হইতে কিছুতেই সে নিষ্কৃতি পাইবে না।

সে ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া, এখানে সেখানে পা ফেলিয়া কোনও রকমে যজমানদের বাড়ীর পূজা সারিতে ব্রজেন্দ্রের বাড়ী হইতে বাহির হইল। এক ব্রজেন্দ্র বাবু ছাড়া অপর সকল যজমানদের পূজা করিয়া সে একবার বাসায় ফিরিতেছিল। তখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ছাতি লইয়াও সে পরিধেয় বস্ত্রকে ভিজা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে কাপড় পরিবর্ত্তনেরও তার প্রয়োজন হইয়াছিল। বাসাবাড়ীর দ্বারমুখে যেই সে প্রবেশ করিবে, অমনি সে দেখিতে পাইল হেমা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই হেমা কতকটা সঙ্কুচিতের ভাব দেখাইল। রাখু সেটা লক্ষ্য করিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময়েও সে আর একবার হেমার এইরূপ ভাবের মত একটা ভাব দেখিয়াছিল। কিন্তু সঙ্কোচের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পূজার তাগিদ করিতে এসেছ নাকি হেমচন্দ্র?"

হেমচন্দ্র অর্দ্ধোচ্চারিতস্বরে উত্তর করিল—"হুঁ।"

"বাড়ীতে গিয়া তোমার মাকে বল, আমি যত শীঘ্র পারি যাচ্ছি।"

হেম এ কথার কোনও উত্তর দিতে না দিতে, পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল—"আর তোমাকে সেখানে যেতে হইবে না।"

হেমার পশ্চাতে কিছু দূরে রাখু প্রশ্ন কর্ত্তাকে দেখিতে পাইল। সে কর্ত্তা মশায়ের ঝি। নামে ঝি হইলেও কার্য্যে সে এক রকম বাসার কর্ত্রীই ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ সন্তান সেখানে থাকিয়া পূজারির কাজ করিত, তাহাদের অধিকাংশই তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিত। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যকদের মধ্যে যাহারা এই দাসীর সহিত কোনও সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে নাই রাখু তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু সে তাহাকে যে নামে সম্বোধন করিত, স্বয়ং কর্ত্তামশাই ও একদিনের জন্য তাহাকে সে কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। রাখু তাহাকে বলিত ঝি, কর্ত্তা মশাই দিবসের অধিকাংশ সময় বলিত 'ওগো'। নিতান্ত দূরে থাকিলে কিম্বা চোখের অন্তরাল হইলে কখন কখন নাম ধরিয়া তাহাকে যেন আপ্যায়িত করিত। অবশ্য অনেকেই এই সম্বোধন বাক্যের ভিতর দিয়া কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে এই পরিচারিকার একটা সম্বন্ধের আভাস দেখিতে পাইত। দেখিলেও সে কথা কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না।

তার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাখু ভিতরে আর হেমা বাহিরে চলিয়া আসিল।

রাখু ঝিকে বলিল—"একবারে না আজ ?"

ঝি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"বোধ হয়।"

"কি বোধ হয় ঝি,—আর কি আমাকে কোনও দিন ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী যেতে হবে না।"

"বোধ হয়।"

শুনিয়া রাখুর মুখখানা সহসা মলিন হইয়া গেল, অথচ নিজে সে ঝিয়ের উত্তরের কোনও অর্থ বুঝিতে পারিল না।

কি তার মুখ দেখিয়া হাসিল। বলিল—"কেন যেতে হবে না বুঝতে পেরেছ ঠাকুর ?"

"বুঝতে পারিনি ঝি!"

"খুব ন্যাকামি জানত দেখছি। কাল কোথায় রাত কাটিয়েছে মনে নেই ?"

রাখুর মুখ দেখিতে দেখিতে আরক্তিম হইল।

"মনে পড়েছে ?" ঝি হাসির তরঙ্গ রোধ করিতে পারিল না। এই বিদ্রূপ হাসি রাখুকে যেন আরও অপ্রতিভ করিয়া দিল।

ঝি বলিতে লাগিল—"ভিজে বেরালটির মত থাক, ওমা, তোমার ভেতরে এত ছিল!"

রাখু এখনও কোন উত্তর দিতে পারিল না কোনও কথা সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। একবার অন্যমনস্কের মত পিছনে চাহিতেই দেখিল হেমা আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে।

রাখুর সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই হেমা সন্ত্রস্তের মত সরিয়া গেল।

তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না দেখিয়া কথায় এইবারে অনেকটা করুণার সুর বাঁধিয়া ঝি বলিল—"গরিবের ছেলে, দু পয়সা রোজকার করতে কলকেতায় এসেছ, এমন বোকামিও করে! কলকেতা সহর—আমোদ করবার কি আর জায়গা ছিল না, তাই বেছে বেছে বাবুর মেয়েমানুষটির ঘরেই ঢুকেছ ?"

রাখু এইবারে বুঝিল—পূর্ব্বরাত্রির কথা তার মনে পড়িল—সে তবে ব্রজেন্দ্র বাবুরই রক্ষিতার গৃহে আশ্রয় পাইয়া সারারাত পরম আনন্দে অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে!

"তুমি কি মনে করেছ ঝি ?"

সে বয়সে হাসিকে যতটা কোমল মধুর করিবার করিয়া ঝি উত্তর করিল—

"আমি ত যা মনে করবার করেইছি, আর পাঁচজনে আরও কত রকম মনে করেছে, যারা তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখেছে।"

রাখুর মাথাটা অবনত হইল। সেই ঝঞ্ঝাগর্ভ ঘনতমসার রাত্রি চারুর সঙ্গে তার মধুর মিলনের এত সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিল ?

ঝি তার অবস্থা দেখিয়া কতকটা ক্ষুণ্ণ হইল। রাখুকে আশ্বস্ত করিতে সে বলিল "যা হ'য়ে গেছে তার জন্য ভেবেত কোনও ফল নেই। কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা কর। বুড়ো যা বলবে সব কথা কাণে তুলোনা। আমি এখনি ফিরে আসছি। এসে যা বলতে কইতে হয়, আমিই বলব, তুমি কোনও উত্তর ক'র না। বলিয়াই ঝি চলিল। চলিতে চলিতে একবার মুখ ফিরাইয়া যখন সে দেখিল, রাখু পাথরের মূর্ত্তির মত ভূমির উপরে নিরর্থক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া এখনও সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে, তখন নারীসুলভ স্নেহোচ্ছল কথায় তাহাকে বলিয়া উঠিল—"পুরুষমানুষ, কিসের লজ্জা এত তোমার? যাও বুড়োর সঙ্গে দেখা কর। আর, না পার, আমার ফিরে আসার অপেক্ষা কর। ব্রজেন্দ্রবাবুর বাড়ী আর যেতে না পাও, কলকেতায় কি আর পুজো করবার বাড়ী নেই। তবে বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা করবার প্রয়োজন নেই। বাঁয়া তবলা বিছানায় গড়াগড়ি দেখে রাগে সে একবারে আগুন হ'য়ে গেছে। তুমি গরীবের ছেলে, সে বড়লোক। টাটকা রাগ হঠাৎ একটা অপমান ক'রে বসতে পারে।" বলিয়া আরও দুই চারিটা আশ্বাসের কথা তাহাকে শুনাইয়া কি বলিয়া গেল।

মাথা হেঁট করিয়া রাখু ব্রজেন্দ্র সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিল। ঝির মুখে ব্রজেন্দ্রের নাম সেটা আরও প্রখর করিয়া তুলিল। সে মনে করিতেছিল ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে একবার দেখা করিবে, তাহাকে সমস্ত ঘটনার কথা সরলভাবে বলিবে। কলিকাতা ত্যাগ ত সে করিবেই—চোরের মত ত্যাগ করিবে কেন ? ঝির কথায় বুঝিল, বাবুর সঙ্গে দেখা করায় অপমান ভিন্ন তার অন্যলাভ ঘটিবে না। চরিত্রগত দুর্ব্বলতায় বাবু ত সবল চোখে তার নিষ্কলঙ্ক মুখের পানে চাহিতে পারিবে না। লালসা-কোলাহলে বধির কর্ণ তার মুখের সত্য কথা-গুলাত তার হৃদয়ের কাছে উপস্থিত করিবে না; হলফ করিয়াও যদি সে বাবুকে, রাতে যা যা ঘটিয়াছে, শুনাইয়া দেয়, এ মর্ম্মাহত ধনী শক্তিমানত তার একটা কথাও বিশ্বাস করিবে না!

ব্রজেন্দ্রের ক্রোধের মাত্রাটা অনুমান করিতে গিয়া রাখু শিহরিয়া উঠিল।

তার বেশ বোধ হইল, এখন অদৃষ্টে যাই থাকুক্, চারুর ঘরে এই বাবুর চোখে না ফেলিয়া ভগবান তাহাকে বেশ্যা-গৃহে অপঘাত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ভ্রমটাও সে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিল, কি একটা অশুভক্ষণে স্মৃতির মোহে চারুকে রাণীর মত দেখিয়া আত্মহারা সে এমন একটা কাজ করিয়াছে যে, এতদিনের দুঃখে দারিদ্র্যের ভিতরেও যে মূল্যবান বস্তুটি কাল পর্য্যন্ত কেহ তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে পারে নাই, আজ তাহা সেই তার চির-নির্ম্মল চরিত্র-খ্যাতি সহসা কর্দ্দমাক্ত হইয়া কলিকাতার পথে যে সে লোকের পদদলনে মথিত হইতে চলিয়াছে। তার নিষ্কলঙ্কতা বুঝাইবার কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া সে চক্ষু মুদিল।

মুদিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল, দীপালোকের শত সূক্ষ্ম রশ্মির তারে গাঁথা সেই অপূর্ব্ব গানের আধার চারুর হাসি-অশ্রুর প্রয়াগ সঙ্গম মুখশ্রী। একটি পলক-ব্যাপী রূপের ইঙ্গিতে যেন আকাশ হইতে মর্ম্ম-বেদনা মাখিয়া সে তাহাকে শুনাইতে বলিয়া উঠিল—ওগো, আমাকে ভেঙে দিয়োনা।

সে স্থির করিল, ভাগ্যে যাই থাকুক, কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্র বাবুর সঙ্গে একবার সে দেখা করিবে।

কর্ত্তামশায়ের সঙ্গে দেখা হইতেই রাখুর যথেষ্টই তিরস্কার ভাগ্যে ঘটিল। ঘটিল তার অনেক সম-কর্ম্মীর সম্মুখে। তাহারাও বৃদ্ধের তিরস্কারের সঙ্গে দুই একটা টিট্‌কারীর কথা যোগ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। যে ভয়ে রাখু চারুর দত্ত পট্টবস্ত্র পরিয়া তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারে নাই, তাহাও সে এড়াইতে পারিল না—বাড়ীওয়ালার ঘরের মেয়েরা গৃহিনী হইতে ছোট ছোট মেয়ে বউ পর্য্যন্ত রাখুর রাত্রি-বিলাস কথা শুনিতে অন্দরের দুয়ারে আসিয়া কবাটের ফাঁকে ফাঁকে চোখ দিয়া দাঁড়াইল।

সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, রাখু আপনার যা কিছু সব লইয়া ক্রুদ্ধ কর্ত্তার নির্দ্দেশ মত বাসা পরিত্যাগ করিল।

(৩৬)

ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া রাখু যখন বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন যেদিক দিয়া প্রতিদিন ঠাকুর পূজা করিতে যাইত, সেই পথ ধরিয়া সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে মেয়েদের মধ্যে কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে উপরে উঠিতে হইল।

যে সময় নির্ম্মলা ও শুভার মা'র মধ্যে তার সম্বন্ধেই কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তখন ত্রিতলে উঠিতে রাখুর মাত্র পাঁচ ছয়টা সিঁড়ি বাকি। দৈব-নির্ব্বন্ধে সে সেই কথাগুলা শুনিতে পাইল। শুনিবামাত্র তার মনে হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তার সহসা কম্পিত পদদ্বয় আর তাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করিল না। ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সাহসও সে হারাইল।

অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিতে যেমন সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে পা দিয়াছে অমনি সে দেখিতে পাইল,আধমুক্ত বক্ষ দুই হাতে ঢাকিয়া শুভা তাহাকে দেখিয়া পলাইতেছে। শুভা কলতলা হইতে স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছিল। রাখু বুঝিল চোরের মত চলিয়া আসা কাজটা তার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। নহিলে তার পদশব্দে বালিকা নিজকে সাবধান করিতে পারিত।

এখন আর সে ভুল সংশোধনের উপায় নাই বুঝিয়া পলায়নপর বালিকাকে সে সম্বোধন করিয়া বলিল—"দিদি! তোমার বৌদি এই কাপড় ছাতি আমাকে আজ ব্যবহার করিতে দিয়েছিলেন, এইখানে রেখে যাচ্ছি, তুমি তাঁকে দিয়ো।"

ইহার মধ্যে শুভা কাপড় ঠিক করিয়া লইয়াছে। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"আপনি আজ পূজা করিবেন না?"

"না।"

"কেন?"

"সেটা তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কর!"

"বৌদি যে আপনাকে আজ নিমন্ত্রণ ক'রেছেন!"

"আমি থাকতে পারব না। আজই আমাকে দেশে ফিরতে হবে। খেতে গেলে গাড়ী পাব না। তোমার বৌদিকে ব'ল।"

উত্তরের আর অপেক্ষা না করিয়া রাখু একবারে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল।

যদি সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টির একটা বড়রকমের ঝোঁক না আসিত আর বুঝি নির্ম্মলার সঙ্গে তার দেখা হইত না। বাহির দরজায় দাঁড়াইয়া সে ক্ষণেকের জন্য বৃষ্টির বেগ হ্রাসের অপেক্ষা করিল। তাহার নিজের একটা ছাতি ছিল, কিন্তু তাহা এমন জীর্ণ ও এতস্থানে ছিন্ন, সেই ধারাবর্ষণে সেটা তাহার বিশেষ কিছু উপকারে আসিত না। যদিও ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে আর একমুহূর্ত্তও থাকিতে তার ইচ্ছা ছিল না, মানুষের মজ্জাগত আত্মরক্ষার অভিলাষ আরও কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে সদর দরজায় ধরিয়া রাখিল।

যতই রাখু ধীর হউক, শুভার মা'র মুখের কথা শুনিয়া, এক মুহূর্ত্তেই সে বাড়ীর সকলের উপরেই তাহার কেমন একটা বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। সে সেই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল, যদি ইহার পর কখনও কোনও কালে ইহারা তার নির্দ্দোষিতা বুঝিয়া অনুতপ্ত হয়, তথাপি আর সে এ বাড়ীতে পূজারির কাজ করিবে না। ইহাদের শত অনুরোধে জল গ্রহণ পর্য্যন্ত করিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে রাখুর কেমন একটা তন্ময়তা আসিল। তাহার পল্লীগত আজীবনের দারিদ্র্য কতকগুলা অভিমান সেই তন্ময়তায় প্রবিষ্ট করাইয়া তার দেহটাকে পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিয়া দিল। সহসা তার মুষ্টিবদ্ধ হস্ত একদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অমনি পশ্চাতে এক মৃদু আর্ত্তনাদ. তার বজ্রমুষ্টি এক অতি কোমল দেহে আঘাত করিয়াছে।

অতি বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া যাহা সে দেখিল, তাহাতে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল। শুভা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দাঁড়াইতে অশক্ত, একবারে বসিয়া পড়িয়াছে। রাখু দেখিল তার অঞ্জলি ভেদিয়া রক্ত ঝরিতেছে।

"আমি একি সর্ব্বনাশ করলুম!"

"কিছুই করেন নি।" বলিয়া নির্ম্মলা অন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিল এবং সত্বর শুভাকে উঠাইয়া তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিল।

রাখু প্রাণহীনের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নির্ম্মলা বসনাঞ্চলে শুভার মুখ মুছাইতে মুছাইতে রাখুর চোখে সমবেদনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল—"আপনি কিছু মনে করবেন না। যা কিছু ঘটেছে সব আমার দোষে। আমি অভাগী যদি আপনাকে দূর হইতে ডাকিতাম! আপনি আজ যেতে পাবেন না। আমি কোনও মতে আপনাকে যেতে দিব না।"

ঠিক এমনি সময়ে, কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া বারান্দার দিক হইতে নালু বাবু ছুটিয়া আসিল। সে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে নির্ম্মলা তাহাকে বলিল—"ভট্টাচাজ্জি মশাইকে তোর পড়বার ঘরে নিয়ে যা।" খবরদার ওঁকে যেন চলে যেতে দিস্‌নি।" বলিয়াই নির্ম্মলা শুভাকে লইয়া চলিয়া গেল। অন্দরের দোর দিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল নালু বাবু এক হাতে বুচকি, অন্য হাতে রাখুর হাত ধরিয়া তাহাকে বারান্দায় তুলিতেছে।

(৩৭)

চারুর চিঠিখানা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যসত্যই ব্রজেন্দ্রের সদ্‌বুদ্ধি জাগিয়াছিল, কিন্তু গঙ্গাস্নানের নামে ঘর হইতে বাহির হইয়া তখনও পর্য্যন্ত ফিরে না আসার সংবাদ তাহাকে কতকটা হতবুদ্ধি করিয়া দিল। বিশুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়াও, চারুর গঙ্গাস্নানে যাওয়া কথাটাই ধারণা করিতে তার মনের ভিতরে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী সংশয় সহসা প্রবিষ্ট হইয়া তার বুদ্ধিকে এমন জটিল করিয়া তুলিল যে, প্রথমে সে সংবাদটাকে কোনও মতে সত্যের পার্শ্বে বসাইতে পারিল না। অথচ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করাইতেও তাহারা তাহাকে কোনও একটা নির্দ্দেশের ইঙ্গিত করিল না।

দুই একটা বড় পার্ব্বণ ছাড়া, যতদিন চারু তাহার কাছে ছিল, একদিনের জন্যও তাহাকে সে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেখে নাই। যে দুই একদিন সে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, ব্রজেন্দ্রের অনুমতি লইয়াই গিয়াছিল। এবং গিয়াছিল ব্রজেন্দ্রেরই গাড়ী করিয়া। দূরস্থ নদীতীরে কোনও দিন তার জ্ঞানতঃ চারু পদব্রজে যায় নাই। গঙ্গাস্নানে যাইতে কখনো যে চারুর আগ্রহ ছিল, তাহাওত একদিনের জন্য ব্রজেন্দ্র বুঝিতে পারে নাই! চারুর স্নানে বিলাস ছিল, খরচ ছিল।

সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া ঠিক ঐরকম দিনে তার গঙ্গায় যাওয়া এবং ফিরে না আসা—এই দুইটী অদ্ভুত ব্যাপার রহস্যের আকারে তার বুদ্ধিটাকে যে সংশয়-কলুষিত করিবে ইহাতে বিচিত্রতা কিছু ছিল না। তথাপি সদ্‌বুদ্ধি তখনও পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া শত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল।

মনে মনে এটাত সে স্থির করিয়াইছিল, চারুর চিঠি, বামুনের সঙ্গে রাত্রিবাস, হেমার মুখ হইতে শুনা সমস্ত ঘটনা, চারুর স্নানে যাওয়াও ফিরে না আসা—এ সকলের সঙ্গে যত কিছু রহস্যই জড়িত থাকুক না কেন, এখন হইতে চরিত্রে আর কখন সে অসংযত হইবে না। আর যদি সত্যসত্যই চারু গঙ্গায় ডুবিয়া থাকে এবং সে নিশ্চিত বুঝিতে পারে ওই পূজারি বামুন তার হতভাগ্য স্বামী, তাহা হইলে চারুর সম্পত্তিতে তাহাকে অধিকারী করিতে তার সমস্ত এটর্ণী বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে সে কুণ্ঠিত হইবে না। অন্ততঃ যতটা পারে ব্রাহ্মণকে পাওয়াইয়া চিরদিনের জন্য মনকে সে অনুশোচনা হইতে নিষ্কৃতি দিবে।

চারুর চিন্তায় ব্যাকুল হইতে গিয়া ব্রজেন্দ্র শেষে তার বিষয় অধিকারের চিন্তাকেই একটু গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বসিল। প্রথমতঃ সে স্থির করিল,

চারুর অপঘাত মৃত্যুর সংবাদ বাহির হইতে না হইতেই যখন তার সম্পত্তি লইয়া একটা গণ্ডগোল বাধিবেই, কোম্পানীর কাগজ কয়খানা সে আর হাতছাড়া করিবে না। দ্বিতীয়তঃ নূতন বাড়ীখানার দলিল এখনও পর্য্যন্ত যখন তাহার আফিস হইতে আনা হয় নাই, তখন সেটাকে সম্পূর্ণভাবেই আয়ত্ত করিতে হইবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি। তখনকারমত বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিবার যতপ্রকার উপায় হইতে পারে স্থির করিয়া ব্রজেন্দ্র চারুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

কিন্তু চারুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যেমন সে চারু ও রাখুর পূর্ব্বরাত্রির মিলন-নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিল, অমনি তার ঈর্ষাকুণ্ঠিত দৃষ্টি তার মনে একটা বিষম ক্রোধের ভাব প্রবেশ করাইয়া সমস্ত তার সদ্‌বুদ্ধিকে কুক্ষিগত করিবার জন্য অগণ্য বাহুদিয়া যেন আঁকড়িয়া ধরিল। যদি একটু শিক্ষার কোমলতা, এবং মর্য্যাদার অভিমান সান্ত্বনার আভাসে তার ক্ষুব্ধচিত্তকে অনেকটা শান্ত না করিত, তাহা হইলে নিশাশেষে হেমার মুখ হইতে ঘটনা শুনিয়া রিভলভার লইয়া সে যে অভিনয় করিতে বসিয়াছিল, রাখুকে নিকটে পাইলে অথবা চারুকে উপস্থিত দেখিলে সেই প্রকারের একটা অভিনয় না দেখাইয়া সে ক্ষান্ত হইতে পারিত না।

দেখামাত্র সে প্রথমটা প্রকৃতি হারার মত হইল। সোফার উপর সাজানো বাঁয়া, তবলা, হারমোনিয়ম উভয়ে উভয়ের সম্মুখে রাখিয়া রাখু ও চারু যেরূপ মুখামুখী বসিয়াছিল, সেইরূপভাবেই পড়িয়াছিল। সোফার নীচে খোল, দাঁড়া আরসীর তলায় অযত্নরক্ষিত বুরুষ চিরুণী, ঘরের প্রায় একরূপ মধ্যেই রাখুর ভুক্তাবশেষ বুকে লইয়া শ্বেতপাথরের থালাবাটি। এই সকল দেখিয়া এবং তাহাদের সাহায্যে চারুর ও রাখুর অবস্থান কল্পিত করিতে গিয়া সে পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা যেন প্রত্যক্ষের মত দেখিয়া ফেলিল।

সে যেন দেখিল গায়িকা চারুর বিলোল দৃষ্টি এই নবাগত বাদকের চতুর কটাক্ষের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছে। তার বাজানোর বোলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে, চারুর সেই অপার্থিব সুরতরঙ্গ অবলম্বন করিয়া, লালসার পর লালসা তার মুখে, চোখে, অধরে, নিশ্বাসে পাগলের মত জড়াইয়া ঘরের বাতাসকে এমন কি সমস্ত বস্তুগুলাকে পর্য্যন্ত পাগল করিয়াছে। সকলেই যখন পাগল হইয়াছিল, তখন ওই ভিখারী বামুন—ওই চাঁদ হাতে করা বামন—ওই কি একাই কেবল স্থির ছিল?

প্রশ্নটা মনে উঠিতেই ব্রজেন্দ্র নিজেই তার যথাযোগ্য উত্তর আপনাকে শুনাইয়া বাস্তবিকই কিছুক্ষণের জন্য ক্রোধে প্রকৃতি হারার মত হইয়া উঠিল। পূর্ণ তিন বৎসর ধরিয়া সে যে চারুর একরূপ পূজা করিয়াছে। অর্থের পর অর্থ তার পায়ে ঢালিয়া অলঙ্কারের পর অলঙ্কারে তার অঙ্গ সাজাইয়া তাহার শান্ত সুশীলা স্ত্রী আজিও পর্য্যন্ত যে আদর তার কাছে পায় নাই, তার শতগুণ আদর আপ্যায়ন ইষ্টদেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলির মত চারুর শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে সে উপঢৌকন দিয়াছে। এততেও সে সর্ব্বনাশী বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ইতস্ততঃ করিল না!

সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা মনে করিতে সাহস না হইলেও চারুর চিঠির অনেক কথাতেই ব্রজেন্দ্রের বিষম সন্দেহ হইল। তার গঙ্গায় ডুবিয়া মরাটা সে কিছুতেই মনে আনিতে পারিল না। রাত্রির ক্রিয়া কলাপ সমস্তই বিদিত হইয়াছে জানিয়া বিশ্বাসঘাতিনী বাড়ীর আশে পাশে কোনও স্থানে গা ঢাকা দিয়া আছে। কোথায় আছে, ঝি চাকর দুজনেই, অন্ততঃ ঝি নিশ্চয়ই জানে।

তথ্য বাহির করিবার নানারূপ চেষ্টা যখন ব্রজেন্দ্রের ব্যর্থ হইল তখন সে উভয়কে যত পারিল তিরস্কার করিল এবং যখন তাহাদের নির্দ্দোষিতার হাজার রকমের কৈফিয়তে তার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম করিল, তখন সে মনে মনে স্থির করিল চারুকে যে কোনও উপায়ে জব্দ করিতে হইবে। নহিলে কি হঠাৎ একটা দৃষ্টির নেশায় পড়িয়া পাপিষ্ঠা ব্রজেন্দ্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি ওই বামুন-নামধারী একটা বর্ব্বরের সেবায় উড়াইয়া দিবে।

ব্রজেন্দ্রের যখন ঠিক এইরূপ মনের অবস্থা, তখন হেমা তার তত্ত্ব লইতে নির্ম্মলা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সেও গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চারুর রাত্রিকালের বিলাসচিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সুতরাং আগে হইতেই মোহগ্রস্ত প্রভুকে কথায় উত্তেজিত করিতে তার বিলম্ব হইল না। সেই উত্তেজনার মুখে ব্রজেন্দ্র তাহাকে বলিয়া দিল, বামুন যাতে তার বাড়ীর ঠাকুর আর স্পর্শ না করে তার ব্যবস্থা করিতে।

চারু মরিয়াছে এবং বাঁচিয়াছে এই দুইটা অনুমানের ভিতরে ব্রজেন্দ্র যত পারিল চিন্তার একটা অভঙ্গ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। যখন তার মনে হইল চারু বাঁচিয়া আছে, তখন সে ঘরের ফরাসের উপর চিন্তাচঞ্চল মস্তক লইয়া বহুবার পাদচারণ করিল। যখন সে বুঝিল মরিয়াছে, তখন তার চিন্তানত

মাথা চারুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যেগুলা অতি সহজে হস্তান্তরিত করিতে পারা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল।

* * * * * *

চারু মরিয়াছে ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া এবং সে জন্য যথা কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন করিয়া যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কলাশিল্পে সত্য

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

শিল্প সম্বন্ধে পুরাতন ও নূতন ভাবুকদের জন্য এক চিরন্তন বিবাদ রহিয়া গিয়াছে। পুরাতনপন্থীরা স্বভাবতঃই বয়োধর্ম্মবশতঃ সংরক্ষণশীল, আর নূতন ভাবুকের দল চিন্তারাজ্যের সব বাড়ীগুলাই ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়। কলাশিল্পে—অর্থাৎ কাজে, চিত্ররচনায় ও ভাস্কর্য্যে এই বিষয়টী গভীরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের জোয়ার যেমন বাঁধ বাঁধিয়া সীমাবদ্ধ করা যায় না, তেমনি নূতনের দল কোন বাধাই মানিতে চায় না। ফরাসী নাট্যকার ব্রিয় (brieux) একখানা নাটক লিখিলেন—"Damaged goods" নাটকের বস্তু—উপদংশ—ঘটিত ব্যাধি সমাজশৃঙ্খলার অভাববশতঃ কেমন করিয়া পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ওস্কার ওয়াইল্ডের 'Salome' ইবসেনের Ghosts, বিয়রন্‌সনের Marit ইত্যাদি আজকালের সৌখীন সমাজ পাঠ্য বইগুলি নবীনগণের মধ্যে আদর লাভ করিলেও বয়োবৃদ্ধগণের নিকট ইহারা দুষ্পাচ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইয়োরোপের যে দেশের কথাই ধরি না কেন, খ্রীষ্টান সভ্যতা যে খ্রীষ্ট প্রদর্শিত পথে চলিতে পারে নাই, তাহা ইয়োরোপীয় সাহিত্যালোচনায় বেশ বোঝা যায়। তাই বোধ হয় দার্শনিক অধ্যাপক Seeley তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত Ecce Homo নামক পুস্তকে খ্রীষ্টের অতিমানুষ ও মানুষ মূর্ত্তির সমন্বয় ব্যাখ্যা করিতে নামিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের দল নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিবেন—'সাহিত্যকে ধাপার মাঠ করিলে তাহাতে জোর ফসল ফলাইতে পারিবে সত্য, কিন্তু ও ভূমি যে দেবোত্তর করা

চলিবে না! ও কলুষ ভূমিতে দেবতার দেউল কেমন করিয়া নির্ম্মাণ করিবে?' তাঁহাদের মতে সাহিত্যে 'সুরুচি' বলিয়া একটা মস্ত বড় জিনিষ আছে। অবশ্য, এটা এই দেশের মত। যে পাশ্চাত্য দেশ আমাদের ভাষা ভাব, ধ্যান ধারণা, আশাআকাঙ্ক্ষা এমন অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, সেই দেশের Laus Veneris বা মকরকেতনের স্তবোক্তি আমাদের মস্তিষ্কে যাহাতে কোনও রূপে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য তাঁহারা আমাদের সবকটা ইন্দ্রিয়ের দ্বার একবারে বন্ধ করিয়া দিতে বলেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, উদ্দেশ্য লইয়া কখনো কোনও শিল্প রচনা হইতে পারে না,— হইলেও সে শিল্প সর্ব্বজন গ্রাহ্য বা Classic হইতে পারে না। শিল্পীর মন আকাশের বায়ুর মত স্বৈরগতি, ঝরণার জলের মত অবিরাম ও উদ্দাম। নদী কবে পাহাড়ের নিভৃত নির্জ্জন আঁধার কন্দর হইতে বন্ধুর কঠোর কূলভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে নিজেই জানেনা, কিন্তু তবুও তার ছোটার বা বহিয়া যাইবার বিপুল আবেগ একটুও কমে নাই। শিল্পীর মন যখন কোনও একটা বিশেষ কল্পনাসৃষ্টির মোহে আবেশময় হইয়া পড়ে, তখন সে বুঝিতেই পারে না যে কোথায় তাহার শেষ! সব সৃষ্টির মূলে এই আঁধার, এই গোপনতা, এই আনন্দ বিভোর আত্মবিস্মৃতির ভাব। ধ্যানপ্রশান্ত শিব যেমন আপনার ধ্যান লোকেই আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সিসৃক্ষু শিল্পী তেমনি সৃষ্টির মোহে আপনার মধ্যেই আপনি আত্মসংবৃত হইয়া যান। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া শিল্পী আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৌশল দেখাইতে পারেন নাই, যদিও বা দেখাইতে চেষ্টা করেন,সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া যায়।

সুতরাং শিল্পীর রচনার মূলই যখন উদ্দেশ্যহীন, তাহার বিরুদ্ধে কোনও সুরুচি বা কুরুচির উদ্দেশ্য আনা চলে না। অন্ততঃ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ব্যতিব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। পাখী গান গায়—কারণ গান তাহাকে গাহিতেই হইবে, সে গান শুনিয়া কেহ আনন্দ পা'ক আর না-ই পা'ক, তাহাতে তার কিছু আসে-যায় না। যুঁই ফুল ফুটিলেই সৌরভ ছুটিবে, কিন্তু ফুল সে সৌরভের উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া কখনো গন্ধের নির্য্যাস প্রকাশ করে না। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্' আগাগোড়া পড়িয়া গণিতজ্ঞ নিউটন্ অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'And what does it prove—কি বুঝাতে চায় বইখানা?' শিল্প যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় ও শিল্পীর প্রাণের কথাটী অভিব্যক্ত করে, তাহা হইলে সে শিল্পটী জনসমাজে চিরকালের আসন পায়। মানবের হৃদয়ের যেগুলি

মুখ্য বৃত্তি—দয়া, প্রেম, বাৎসল্য, প্রতিশোধেচ্ছা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি ইহারাই উচ্চদরের শিল্পীগণের কল্পনাকেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে। পুস্তকের যেখানটা আমাদের খুব ভাল লাগে, সেখানটা এইরূপ মনের একটী সহজ, অখণ্ড ও সরল ভাবই প্রকাশ করে। লেডী ম্যাকবেথের উন্মাদ অবস্থার কাহিনী, প্রতিশোধপরায়ণ ওথেলোর ডেসডিমনাকে হত্যা, পাপভ্রষ্ট আডামের ঈভ্‌কে ক্ষমা, এব্‌সালোমের মৃত্যুতে করুণ খেদোক্তি—সাহিত্যে এইগুলি সহজেই আমাদের হৃদয়মন সমবেদনাতুর করিয়া তোলে। তাই শ্রেষ্ঠ রচনার রসসৃষ্টিভেদে আমাদের মানসিক ভাবটীও তদনুরূপ ভাব-প্রণোদিত হয়।

কলাশিল্পের যে মূর্ত্তি অমোদের চোখে পড়ে, তাহা সত্যেরই মূর্ত্তি। সত্যকে মিথ্যার আচরণ দিয়া শিল্পী কখনো প্রকাশ করেন না। তাই Rowley Poems এর রসমাধুর্য্য যে কৃত্রিম, তাহা রসগ্রাহীর নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। জনন-ক্রিয়াটা যে সকলের কাছে 'প্রকাশ্য গোপনতা (open secret of nature) তাহা জার্ম্মান কবি গয়টে একদিন বন্ধু একার্‌মান্‌ (Echermann) এর নিকট বলিয়াছিলেন। এই প্রকাশ্য গোপনতাটা আমরা যতই লুকাইয়া রাখি না কেন, সে কেবল আমাদের মনকে চোখ ঠারা! অতএব ইহাতে শিল্পীরও অধিকার আছে। শিল্পী বিশ্বের মহেশ্বর—সর্ব্বত্র তাহার অবারিত দ্বার। শিল্পীর এই স্বাধীনতাটুকু তিনি নিজ কল্পনাশক্তির বলেই পাইয়া থাকেন। ইহার জন্য কোনও সমালোচকের নিকট charter বা ছাড়-পত্র তাঁহাকে নিতে হয় না। শিল্পী সেক্‌স্‌পীয়রের ভাষায় 'unchartr'd libertine', সমগ্র ইয়োরোপীয়ান সাহিত্য গ্রীশের গথিক্‌ ও আওনিক্‌ (Gothic and Ionic) ভাবে প্রবুদ্ধ। গথিক্‌ সাহিত্যের ধারা ঐরাবত-গতির মত, আর আইওনিক্‌ সাহিত্যের ধারা সর্প-বিসর্পী সূক্ষ্ম গতির মত। গ্রীশ সভ্যতা সুরুচি ও কুরুচির দোহাই দিয়া সাহিত্যের গণ্ডী কদাচ সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয় নাই! আইওস্‌ ষ্টেফানস্‌, (বা কুসুম-মুকুটশোভী আইওনিয়া) সমগ্র জগৎটাই শিল্পীর ইম্পীরিয়ালিজ্‌মে আনিয়া দিয়াছিল। তাই সেখানে ফিডিয়াস, হোমর, ঈস্‌কাইলাস, সফোক্লিস ও প্লেটো। আমাদের বুদ্ধির মাপকাঠি ত বড় বেশী লম্বা নয়, সুতরাং আমাদের জন্মগত সংস্কার লইয়া কোনও সাহিত্যের আলোচনা করিয়া যদি সেখানে আমাদের সংস্কার-বিরুদ্ধ কিছু দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের নাসিকা-কুঞ্চন না করাই ভাল।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বা কলাবিৎগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

এই কারণেই সমাজে অনাদৃত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী এই জন্যই একদল লোকের নিকট চির-নিন্দিত হইয়া আছে। বৈষ্ণব কবিগণের এমন অনেক রচনা আছে যাহাতে রূপকের কোনই অবসর থাকে না। সে গুলি যেন নিছক কাম-স্তুতি। ইহা সত্য হইলেও মানবজীবনে যে বৃত্তিটা নিয়ন্তারূপে গোপনে সৃষ্টির ধারা সনাতনকাল হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোন্‌ সাহসে যুদ্ধ প্রচার করিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সত্যকে লুকাইয়া রাখা যায় না, রেডিয়ামের মত ইহা বাহির হইয়া পড়িবেই।

কিন্তু এই যুক্তিতেও প্রাচীনের দল নীরব হইবেন না। তাহারা বলিবেন, 'মানিলাম, বাপু, তোমার কাম-রচনার সার্থকতা। কিন্তু ওটার উপর অত ঝোঁক (emphasis) দাও কেন, বলত? কাজকর্ম্ম না পেলেই কি খুড়ার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা?'

সাহিত্যে যাঁহারা বিদ্রোহবাদী, তাঁহারা নিজের প্রতিভার গতি হিসাবে স্বকীয় পন্থা স্থির করিয়া লন। এইরূপে ভিক্টোরিয়া যুগের শেষ সময় সুইন্‌-বার্ণ-প্রমুখ 'কমলবিলাসী' কবিকুলের (Fleshly school of poets) উদ্ভব হইয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও ভাবের নগ্নতাই (Eterde sur la nude) যাঁহারা স্বীয় শিল্পের মুখ্য উপাদান করিয়া লইয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহারা হিন্দুবধূর লজ্জাবরণগুণ্ঠিতা মূর্ত্তি দেখাইবেন? এ যে অদ্ভুত দাবী!—পরন্তু আমাদের মনের ভাবের বাহ্য প্রচার হইলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল? প্রতিভার বিকাশ 'মৌনং হি শোভনং' উক্তি মানে না, এই যা দুঃখ! বিশাল বিশ্বসৃষ্টির মূলে সর্ব্বত্রই একটা উদ্দাম প্রকাশের ইচ্ছা। যৌবন লইয়াই সৃষ্টি। বৃদ্ধের জীবনেও এই ঊষার অপূর্ব্ব তারুণ্য ফুটিয়া বাহির হয়। তাই আমেরিকান্‌ লেখক লাওয়েল্‌ গয়্‌টের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে জীবনের দুই দিকেই তিনি কিশোর (He was a child at both ends of his career')। সৃষ্টি এই চিরকিশোরকে লইয়াই আপন অভীষ্ট পথে অনন্ত কাল ধরিয়া ছুটিয়াছে। জীবনে যাহা সত্য বলিয়া পূজা করি, আদর করি, বুকে টানি,—শিল্পেও তাহার সমান পূজা, সমান আদর, সমান সম্মান। 'ভারতীয় শিল্পকলা পদ্ধতি' তাই এতদিন অনাদর ও উপেক্ষার আওতায় পড়িয়াআজ সমাজে একটু স্থান পাইয়াছে কিন্তু এখনও 'জলাচরণীয়' হইতে পারে নাই। চিরাচরিত প্রথাগুলি বীজ গণিতের নিয়মের মত—$(a \times b)^2 = a^2 \times 2ab + b^2$। শিল্প কিন্তু এই নিয়মের গণ্ডীতে ধরা পড়ে না। তাই শিল্পের সাধনা—কঠোর সত্যের সাধনা।

হৃদয় যখন অরুণ শতদলের মত বিকচ প্রফুল্ল হইয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই শিল্পের প্রকাশ হয়। এমন কথা বলিতেছিনা যে কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বা শিল্পমাত্রই আদরণীয় বা উচ্চভাবদ্যোতক। কিন্তু যে শিল্পে শিল্পীর যথার্থ মূর্ত্তিটী ধরা পড়িয়াছে, তাহা আর শিল্পীর নিজস্ব 'সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত থাকে না,—তাহা তখন সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বকালের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। আর যথার্থ শিল্প কয়টাই বা দেখিতে পাওয়া যায়? তাহা অবতারের আবির্ভাবের মতই কদাচিৎ পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের মত গরলপানেই শিল্পীর নিবিড় আনন্দ, সেই গরলপানের প্রমত্ত উচ্ছ্বাসে শিল্পী যুগে যুগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ানো না গেল॥'

অবসাদ

[শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক]

বলি বক্ষে কেন রে থেমে এলো ঘন স্পন্দন?
কেন কণ্ঠে রে তোর ক্ষীণ হয়ে এলো জয়বন্দনা গীতি আজ?
কেন অর্দ্ধেক পথে থমকি দাঁড়ালি,
উচ্ছ্বসি ওঠে হাহাস্বরে ভীরু ক্রন্দন?
বলি কম্পিত বুকে অঙ্কিত, একি!
কিসের অলীক ভীতি লাজ?
এলো ক্ষীণতর হয়ে জয় বন্দনা গীতি আজ!
ওই তীর্থ যে তোর দেখা যায়,—নহে বেশীদূর!
তবু বন কণ্টকে ছিন্ন চরণ
পশ্চাতে কর দৃক্‌পাত্ ওরে শ্রমাতুর?
ছি-ছি! রক্তে কি তোর জ্বলে নাই তবে শাশ্বত হোমশিখা?
ললাটে কি তোর শোভে নাই তবে
সত্যের পূত সিতচন্দন-লিখা?
হায় পরাণে কি তোর বাজে নাই তবে মুক্তির বীণা রে?

ওহো তা'না হলে কেন আঘাতে কাঁদিয়া—
লুটিয়া পড়িছ ধূলায় ভূতলে বনবীথি মাঝ?
এলো ক্ষীণতর হয়ে জয় বন্দন গীতি আজ!
কেন মন জোড়া তোর অবসাদ এত অবসাদ?
কেন আলস আসিছে অঙ্গেতে হায়,—
মিটিয়া গিয়াছে আজি কিগো তবে তব সাধ?
কেন অবসাদ—এত অবসাদ?
বলি আগুণ জ্বালান কথার আড়ালে
আপন লুকায়ে উল্লাসে তুই ছুটিয়া চলিলি কদিন বেশ!
ভাবিলি মানসে এইবার তোর
দুয়ারে এলোরে সে মহাতীর্থ,—স্বাধীন দেশ!
একি ছেলে খেলা—মিছে ছেলে খেলা?
একি বাক্য-বাতাসে বালির দেওয়াল ঠেলে ফেলা?
ওরে চল্ চল্ জোরে চল্ চল্!
আজি আত্মায় তোর উঠুক্ জ্বলিয়া সত্যের জ্যোতি জ্বল্ জ্বল্!
আজি সুপ্তি মাখান মুক্তি ব্যথায় ঝরুক অশ্রু
নয়নে রে তোর ছল ছল!
তুই চল্ চল্ আজি চল্ চল্!
আজি কর্ম্মের ঘায়ে ভেঙে ফেল্—ফেল্
পাষাণ-কঠিন সব বাঁধ!
কেন অবসাদ—মিছে অবসাদ?

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ স্যানাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

পিঙ্গলের অতীত জীবনের প্রায় কোন কথাই আজ আমার আর তেমন সুস্পষ্ট মনে নাই। কেবল তিনি যে সাধু হইয়া সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছিলেন, পরে আমেরিকায় গিয়া মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িবার সময় তথাকার বিপ্লবদলের সংস্পর্শে আসেন, এই টুকুই এখন মনে আছে, কিন্তু কেমন করিয়া এবং কেন প্রথমে সাধু পরে ইঞ্জিনিয়ার ও তৎপরে বিপ্লবপন্থী হইলেন তাহা আর আমার কিছুই মনে নাই, পিঙ্গলেও এ বিষয়ে আরও কিছু বলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

এই অধ্যায় হইতে আমার বলিবার অনেক কথাই যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাই হয়ত কত কথা আর বলা হইবে না। এই ভুলে যাওয়া ও মনে থাকার সহিত আমার মনে হয় আমাদের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমাদের স্মৃতিপটে কত বড় জিনিষ ছোট হইয়া যায়, ও ছোট জিনিষ বড় হয়, আবার অনেক কথা কেমন আমরা ভুলিয়াই যাই তাহার অর্থ বোধ হয় এই যে যাহা আমাদের স্বভাবের অনুকূল যাহা আমাদের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় তাহা ঘটনাই হউক বা কোনও দার্শনিক মতই হউক, অথবা আর যাহাই হউক না কেন, তাহা যেন জ্ঞাতসারে আমাদের স্মৃতিপটে ছবির মত আপনিই অঙ্কিত হইয়া যায়; আর যাহা আমাদের স্বভাবের প্রতিকূল তাহা হয় ভুলিয়া যাই আর না হয়ত যেন কেবল খণ্ডন করিবার জন্যই তাহাকে গ্রহণ করি এবং এই খণ্ডন করিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি ও ঘটনা আমাদের সাহায্য করে সেগুলিও বয়স ও অভিজ্ঞতার সহিত অর্জ্জন করিতে থাকি।

আর একদিন আণ্ডামানে থাকিতে, বোধ হয় রামেন্দ্রবাবুর জিজ্ঞাসা অথবা বিচিত্র প্রসঙ্গ পড়িয়া ঠিক এইরূপই আরও নানারূপ চিন্তার ধারা মনের মধ্যে গভীরভাবে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং এগুলি আমি একটি নোট বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। উপেনদাকে প্রায়ই সেগুলি আমি দেখাই-

তাম,উপেনদা ভাল. বলিলে মনে বড় আনন্দ হইত। কি করিয়া সেই নোট বইটি নষ্ট হয় আণ্ডামানের কাহিনীর সহিত তাহা বলিব।

পিঙ্গলের কাশী আসিবার দিনদুইএকের মধ্যেই তাঁহাকে পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিঙ্গলের বিশেষ অনুরোধ ছিল যেন আমরা পাঞ্জাবে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বোমা পাঠাই; সেই জন্য পিঙ্গলেকে বলা হইয়াছিল যে বোমা পাঠাইতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু এক একটি বোমা করিতে প্রায় টাকা ১৬ করিয়া খরচ, তাই টাকার সাহায্য না পাইলে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বোমা পাঠান সম্ভব হইবে না। তাঁহাকে পৃথ্বী সিং ও কর্ত্তার সিংদিগের কথাও বলা হইয়াছিল। এই টাকার জন্যও পাঞ্জাবীদের যথাযথ খোঁজ লইবার জন্য পিঙ্গলে পাঞ্জাবে গেলেন। পিঙ্গলের নিকট তাঁহার কয়েক-জন সঙ্গীর ঠিকানা ছিল। প্রায় সপ্তাহকালের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। রাণ্ডদারও পাঞ্জাবে যাইবার এখন আর কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু তাঁহার যাইবার পূর্ব্বে আমি আর একবার পিঙ্গলের সহিত পাঞ্জাবে গেলাম।

ডিসেম্বর মাসের সকালবেলায় কন্‌কনে শীতে সাধারণ হিন্দুস্থানির বেশে আমিও পিঙ্গলে অমৃতসর সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমি পাঞ্জাবি ভাষা বলিতে পারিতাম না, কিন্তু পিঙ্গলে পারিতেন। আমরা একটি গুরুদ্বারায় আসিয়া নামিলাম। এইখানে পিঙ্গলে একজন পাঞ্জাবি নেতার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইহার নাম মূলাসিং।

মূলাসিং শ্যাংহাইতে পুলিশের কাজ করিতেন ও সেখানেও পুলিশ ধর্ম্মঘট কারীদের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। এবারে পেনাঙ্গের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীদিগের সহিত ও পরিচয় হইল। এই সময় গ্রামের অনেক শিখদিগকে এখানে যাওয়া আসা করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা অধিকাংশই চাষা মজুর শ্রেণীর লোক, কিন্তু তাঁরাও দেশের কাজের জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, শিখসম্প্রদায়ের এমনই শিক্ষা দীক্ষা। ইঁহাদের কাহার ও কাহার ও শরীর দেখিতে যেন ঠিক দৈত্যের মত ছিল।

এইবারে আমি মূলাসিংকে কেন্দ্রের আবশ্যকতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি এবং ইহার পর হইতে মূলাসিংই কেন্দ্রের ভার লইয়া বসেন। কিন্তু মূলাসিং এইরূপে কেন্দ্রে না বসিলেই ভাল হইত।

পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশাগত কর্ম্মীরা কর্ম্মের অভাবে ও খাওয়া দাওয়ার

অসুবিধায় খুঁত খুঁত করিতেছিলেন এবং ইঁহাদের অনেকের মধ্যেই এক অসন্তোষের ভাব গুমরিয়া উঠিতেছিল। ইহার জন্য মূলাসিংই প্রধানত দায়ী ছিলেন। এই সব কর্ম্মীরা অনন্যমনা হইয়া দেশের কাজ করিবার জন্য দূর দূরান্তর হইতে বাড়ী ঘর ইত্যাদি সব ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহই অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন না বা তখনকার অবস্থায় করিবার উপায়ও ছিল না। এই অবস্থায় যদি পেটের জন্য এ'বেলা ও'বেলা কর্ত্তাদের নিকট অর্থের তাগাদা করিতে হয় ত সত্যই তাহা সকলকারই বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। ইঁহারা সকলেই থাকিতেন গুরুদ্বারায়, খাইতেন সন্নিকটস্থ হোটেলে। আমাদের দেশে দেশের কাজ করিতে গিয়া অনেক সময়ই এইরূপ নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিই অনেকের মনে বেদনা দিয়াছে এবং তাহা হইতে অনেক সময় অনেক অনর্থও ঘটিয়াছে। তাই অনেক সময় মনে হয় আর্থিক হিসাবে স্বাধীন না হইতে পারিলে দেশের ও দশের কাজে নামা উচিত নহে; আবার ইহাও দেখিয়াছি, আর্থিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে যাইয়া অনেক সময়ই অর্থোপার্জ্জনই সার হইয়া পড়ে, এবং অনন্যমনা হইয়া দেশের কাজে না লাগিলে প্রায়ই কোন কাজ হয় না। আবার অন্যদিকে কর্ম্মের অভাবেও অনেক দল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সময় পাঞ্জাবে উপযুক্ত নেতার অভাবে অনেক কর্ম্মীই এইরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন; কর্ম্মহীনতায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, অথচ কর্ম্মীরা কর্ম্ম খুঁজিয়া পাইতেছেন না। রাসবিহারীই ঐরূপ নেতা ছিলেন যিনি উন্মত্ত জনসংঘকে কতক্ পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলেন। আমি আপাততঃ এই গোলমাল যতটুকু পারি শোধরাইবার চেষ্টা করিলাম। মূলাসিংএর নিকট শুনিলাম অনেক রেজিমেণ্টই বিপ্লবের সময় দেশবাসীর দিকেই যোগ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে। যে সকল রেজিমেণ্টে তখনও লোক যায় নাই তাহার তালিকা করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশাগত কর্ম্মীদিগকে সেই সব রেজিমেণ্টে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

মূলাসিংহের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া পিঙ্গলে অন্যান্য পরিচিত শিখদিগের খোঁজে "মুক্তসর"এর মেলায় চলিয়া যান। এই মুক্তসর মেলার পশ্চাতে এক অপূর্ব্ব ইতিহাসের কথা পাঠক বর্গকে না শোনাইলে আমি কিছুতেই সোয়াস্তি পাইব না:—

একবার "আনন্দপুর" দুর্গে গুরুগোবিন্দ সিং স্বীয় পরিবার পরিজন বর্গকে লইয়া প্রায় সাত মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। এই অবরোধ ব্যাপারে উভয়

পক্ষই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। মুসলমান পক্ষ হইতে "আনন্দপুর" ত্যাগ করিবার জন্য গুরুর নিকট বারম্বার প্রস্তাব আসিলেও গুরু তাহাতে সম্মত হইলেন না। গুরু কোন মতেই সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া অনেক বহির্গমনেচ্ছু শিখেরা গুরুমাতা গুজরীকে স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত করাইলেন। গুরু গোবিন্দ সিং কিন্তু তবুও স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ক্ষুধার তাড়নায় ও অবরোধের নানা জ্বালায় কিন্তু অনেক শিখেরাই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পেটের জ্বালায় তখন তাঁহারা গুরুর আদেশও লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত। তখন গুরু গোবিন্দসিং বলিলেন—"তোমরা এতদিন শিখ গুরুর আশ্রয়ে ছিলে, এখন ক্ষুধার তাড়নায় গুরু বাক্য লঙ্ঘন করিয়া শঠদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছ, ইহাতে শিখ গুরুর দায়িত্ব কাটিয়া গেল; অতএব সকলে তদনুরূপ "বে-দাওয়া" লিখিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর।" কেবল ৪০ জন শিখ ব্যতিরেকে আর সকলেই ঐরূপ "বে-দাওয়া" লিখিয়া দিয়া গুরুকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অবশেষে গুরু গোবিন্দ সিংকেও সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল এবং শত্রু তাড়িত হইয়া তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সেই ৪০ জন শিখ কিন্তু কোন অবস্থায়ই গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে গুরু গোবিন্দ সিং মদ্রদেশ আসিয়া পৌছিলে সেই "বেদাওয়া" শিখদিগের অনেকে আসিয়া গুরুদেবের সহিত দেখা করেন। তখন গোবিন্দ সিং বলেন—তোমাদের ইচ্ছা হয় "আমরা শিখ নহি এই কথা লিখিয়া দিয়া তোমরা চলিয়া যাইতে পার।" তখন পুনরায় ৪০ জন শিখ "আমরা শিখ নহি" এই কথা লিখিয়া দিয়া গুরু দেবকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এই বিপদের দিনে শ্রীগুরুকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কিছু পরেই তাঁহাদের মনে বিষম অনুতাপ উপস্থিত হয়। এদিকে "খেদরানা তালাও" নামক এক পুষ্করিণীর নিকট শত্রুপক্ষ পুনরায় গুরু গোবিন্দসিং এর দলকে আক্রমণ করিল। ঘোর সংগ্রাম করিতে করিতে গুরু গোবিন্দসিং দেখিলেন যে শত্রু পক্ষকে আর এক দল কোথা হইতে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে; গোবিন্দসিং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না উহারা কারা। মুসলমানেরাও এই নবাগতদের উন্মাদনায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর প্রায় সকলেই ধরাশায়ী হইলেন। এইরূপ এক মুসলমানের বক্ষে ধরাশায়ী মৃতদেহ তুলিয়া দেখা গেল মৃতদেহ নারীর। ইঁহার নাম মায়া ভাগো, ইঁহারই পরামর্শে ও প্রেরণায় "বেদাওয়া"

শিখগণ স্বীয় দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানের পর গুরু গোবিন্দসিং রণস্থলের প্রতি মৃত শিখের নিকট গিয়া রণক্লান্ত মুখ মুছাইয়া পিতার ন্যায় আদর যত্ন করিতেছিলেন। অবশেষে একজনের দেখিলেন তখনও প্রাণ আছে। ইঁহার নাম মহাসিং। মহাসিংএর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে নানা প্রকারে আদর যত্ন করিতে করিতে গুরু গোবিন্দ জিজ্ঞসা করিলেন "মহাসিং তুমি ফি চাও!" মহাসিংএর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। মহাসিং বলিলেন "আমাদের লেখা আমরা শিখ নহি' পত্রটি নষ্ট করিয়া ফেলুন। এতক্ষণে গুরুজি বুঝিলেন এ দিকে কাহারা যুদ্ধ করিতেছিল। দেখিলেন সেই ৪০ জনাই, এখানে প্রাণ বলি দিয়াছেন। মৃতদেহ মধ্যে নারী দেহও দেখিতে পাইলেন। গুরু গোবিন্দ সিং সেই "শিখ নহি" পত্রটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মহাসিং ও মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলেন। তখন গুরুগোবিন্দ সিং উপস্থিত সকল শিখকে সৎস্বাধন করিয়া বলিলেন "যে 'খালসা' মধ্যে এমন মহাপ্রাণ আছে সে 'খালসা" সহজে নষ্ট হইবে না। একটিও ভক্তপ্রাণ যে স্থানে আত্মাহুতি দেয় সেস্থান পবিত্র হইয়া যায়। যেথানে এতগুলি মহাপ্রাণ প্রাণ বলি দিয়াছেন—অতঃপর সেই স্থানের নাম "মুক্তসর" হইল এবং এস্থানের জলাশয়ে যে স্নান করিবে সেই মুক্ত হইবে।" এইরূপে 'মুক্তসর' মেলার পত্তন হয়। ইহা শিখদিগের মহা মেলা; এখানে প্রতিবৎসর প্রায় লক্ষাধিক শিখ এক হইয়া থাকেন। শিখদিগের প্রতি উৎসবের সহিতই এইরূপ এক একটি অপূর্ব্ব ইতিহাস কথা জড়িত আছে এবং প্রত্যেক শিখই এইরূপ উৎসবউল্লাসের মধ্যেই লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছেন। আমার বিশ্বাস শিখেরা ভারতের এক অপূর্ব্ব জাতি।

পিঙ্গলে যখন "মুক্তসর"এর মেলা হইতে ফিরিলেন তখন কর্ত্তার সিং, অমর সিং ইত্যাদি সকলেই গুরুদ্বারায় উপস্থিত হইয়াছিল। কর্ত্তার সিং আমায় দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "রাসবিহারী কবে আসিবেন?" আমি বলিলাম, "এই এইবার তিনি আসিবেন, এখানে থাকিবার একটা সুবন্দোবস্ত করা হউক, আপনাদেরও কার্য্যের একটু শৃঙ্খলা হউক তবেত আসিবেন।" এই সময় আমি কর্ত্তারসিংকে কেন্দ্রের আবশ্যকতা বিশেষ করিয়া বোঝাই এবং বলি যে মূলাসিং এই কেন্দ্রের ভার লইয়া বসিয়াছেন। রাশবিহারীর জন্য অমৃতসর সহরে দুইটি ও লাহোরে দুইটি বাড়ী লইতে বলি। এ সব বিষয়ে দাদা পূর্ব্ব হইতেই আমায় সব বলিয়াছিলেন;

যেন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বাড়ি নিজেদের হাতে রাখা হয়। এইরূপই ব্যবস্থা হইল; আমি অমৃতসরের বাড়ি স্বয়ং দেখিয়া পছন্দ করিলাম। লাহোরের বাড়ির জন্য আর একজন গেলেন। কর্ত্তারসিং এর নিকট পাঞ্জাবের তদানীন্তন অবস্থায় কথা শুনিয়া বড় আশান্বিত হইলাম, ভাবিলাম এইবার একটু কাজের মত কাজ হইতেছে। এই সময় আর একদল আমেরিকা প্রত্যাগত শিখ অমৃতসর এ আসেন। ইহাঁদের একজন নেতাকে আমি দেখি, একজনত এত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে গালের মাংসগুলি ঝুলিবার উপক্রম করিয়াছিল। যত দূর স্মরণ হয় বোধ হয় ইনিই সেই বৃদ্ধ, যিনি আন্দামানেও অদ্ভুত তেজের সহিত নিজের দিনকয়টি কাটাইয়া ৬০। অথবা ৭০ বৎসর বয়সে আন্দামানেই জীবন বিসর্জ্জন দেন। এত বৃদ্ধ বয়সেও ইনি আন্দামানের ধর্ম্মঘটকারীদিগের সহিত একত্র ধর্ম্মঘট করিতেও কখন পশ্চাদপদ হন নাই। এই দলের কেহ তখন ও পর্য্যন্ত বাড়িতে যান নাই। ইনি পূর্ব্বেই স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ হইতে আমাদের ৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

এই সময় কর্ত্তারসিং অদ্ভুত পরিশ্রম করিতেছিলেন, প্রত্যহ প্রায় ৪০।৫০ মাইল বাইক্এ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে ছিলেন; এত পরিশ্রম করিয়া ও কিন্তু ইঁহার ক্লান্তি ছিল না, যতই পরিশ্রম করিতেছিলেন, ততই যেন ইঁহার স্ফূর্ত্তি বাড়িতেছিল। এই ঘুরিয়া আসিয়া আবার যে সকল বড় বড় রেজিমেণ্টে যাওয়া বাকি ছিল সে সব রেজিমেণ্টে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে কিন্তু নিজেদের কাজ করিবার দোষেই ইঁহাদের অনেকের নামেই ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তার সিংকে ধরিবার জন্য এই সময় একবার পুলিশে এক গ্রাম ঘেরাও করে, কর্ত্তারসিং গ্রামের সন্নিকটেই কোথায় ছিলেন, পুলিশের কথা শুনিয়া বাইকএ করিয়া সেই গ্রামেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিশ অবশ্য তাঁহাকে চিনিত না। সেবার কর্ত্তারসিং এইরূপ অসম সাহসিকতার গুণেই নিষ্কৃতি পাইলেন, তা না হইলে পথে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

এই সময় টাকার খরচ এত বাড়িয়া যায় যে দানের টাকায় আর কাজ চলিতেছিল না, তাই ইহারা কিছু কিছু ডাকাতি করিতে বাধ্য হন। পরে জানা গিয়াছে মূলাসিং লোক ভাল ছিলেন না; ইনি নাকি আবার দলের টাকাও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। যখন এ সব জানা যায় তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না। কারণ যত দূর স্মরণ আছে ইহার অল্প পরেই মাতাল

অবস্থায় ইনি ধরা পড়েন। ইনিই নাকি আবার ব্যক্তিগত শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া একজনার বাড়ীতে ডাকাতি করান।

বড় বড় আন্দোলন মাত্রেই দেখা গিয়াছে যে সাধু ও মহৎ চরিত্রের সহিত এইরূপ নরপিশাচ ও দলে আসিয়া জোটে; এ সব আন্দোলনের দোষ নহে, এ আমাদের মনুষ্য চরিত্রের দোষ। লেনিনও নাকি বলিয়াছেন প্রতি খাঁটি বলসেভিকের সহিত অন্তত ৩৯ জন বদমাইস ও ৬০ জন আহাম্মক তাঁহাদের দলে আসিয়া জুটিয়াছিল। (Russia's Ruin P 249 by H E Wilcox)

এবার পাঞ্জাবে প্রায় সপ্তাহ খানেক ইঁহাদের সহিত থাকিয়া ইঁহাদের অনেক আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। যদিও ইঁহারা অত দারুণ শীতেও অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সারিয়া গুরুগ্রন্থ সাহেব ইত্যাদি পাঠ করিতেন কিন্তু হোটেলে খাইতেন বলিয়া খাওয়া দাওয়া অত্যন্ত নোংরা ধরনের ছিল। ইঁহাদের পরস্পরের ব্যবহার কিন্তু বড় সুন্দর ছিল; সম্বোধন করিবার সময়ে "সন্তো," "সজ্জনো," "বাদশাও" ইত্যাদি প্রকারের সম্মান সূচক শব্দ ছাড়া অন্য কোনরূপ শব্দ ব্যবহার করিতেন না। ভাই নিধান সিংএর সহিত এইবার আসিয়া দেখা হয়। ইনিই সেই ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ। ইনি প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর দেশ ছাড়া ছিলেন ও চায়নায় থাকিতে এক চীনা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইঁহাকে প্রায়ই ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিতাম। একবার ষ্টেসনে গিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়াও ক্ষুদ্র একটি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া আপন মনে পাঠ করিতেছেন। ইনি যে কেবল লোক দেখানর জন্যই ঐরূপ করিতেন তাহা নহে। কারণ আন্দামানেও ইঁহাকে ঠিক এইরূপই দেখিয়াছি। ইঁহার যেরূপ তেজ ছিল অনেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সেরূপ তেজ দেখি নাই।

সাধারণতঃ পাঞ্জাবীদিগের নৈতিক চরিত্র বিশেষ মন্দ এবং পাঞ্জাবিদের মধ্যে আবার শিখদিগের চরিত্র অতি জঘন্য। বোধহয় এইরূপ হইবার প্রধান কারণ পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এখানে অসঙ্গত রূপে কম এছাড়া বোধহয় পাঞ্জাব তমোমুখী রাজসিক ভাবে পূর্ণ। চিরকাল বৈদেশিক-দের সহিত সংঘর্ষের ফলে ক্রমাগত নিম্নতর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এখান-কার শ্রেষ্ঠ সভ্যতা যেন ক্রমেই ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য অব-নতির দিনে এইরূপ বিদেশীর সংস্পর্শ যেমন হানিকারক, উন্নতির দিনেও আবার তেমনই এই স্থানেই শ্রেষ্ঠ সভ্যতার বিকাশ সম্ভবপর। যাহারা মন্দের পথে সহজে যায়, ভাল হইবার ক্ষমতাও আবার তাহাদের মধ্যে যেমন

আছে তত্ত্বের মধ্যে সেরূপ আছে বিনা সন্দেহ; তাই অসংযম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা ও হিংসা বৃত্তিতে শিখ চরিত্র যেরূপ কলঙ্কিত, সেইরূপই আবার সংযম, ঔদার্য্য ও ক্ষমা বৃত্তিতে তাহাদের তুলনা মেলা কঠিন। তাই এই সে দিনও এই অধঃপতিত শিখদিগের মধ্য হইতে "নানকানা সাহেব"এ অমন অদ্ভুত বীর্য্য ও সংযমের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর নামেই কলঙ্ক অধিক কিন্তু এই পাঞ্জাবেই আবার সেদিনও সতীত্বের এমন গৌরবোজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হইয়াছিল যে এ কলিযুগে তাহার তুলনা নাই। লাহোর ডি, এ, ভি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ভাই পরমান্দের খুল্লতাত ভ্রাতা, ভাই বালমুকুন্দ দিল্লিষড় যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়েন। এই বালমুকুন্দেরই সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ মতিদাসকে সেই শিখ অভ্যুদয় কালে করাত দিয়া বিদীর্ণ করিয়া মারা হইয়াছিল। ধরাপড়িবার মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিবাহ করেন। ইঁহার স্ত্রী শ্রীমতী রামরাখি পরমাসুন্দরী পূর্ণবয়স্কা যুবতী ছিলেন। স্বামীর ধরা পড়িবার পর হইতেই ইনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং নানারূপ আত্মনিগ্রহে দিন কাটাইতে থাকেন। পরে স্বামীর মৃত্যুদণ্ডা-দেশ শুনিয়া স্বামীর সহিত দেখা করিতে যান। কিন্তু তাঁহার জীবন সর্ব্বস্বকে তাঁহার মর্ম্মাশ্রু যেন ভাল করিয়া দেখিতেই দিলনা। বাড়ি ফিরিয়া একরূপ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দিন কাটাইতে থাকেন। একদিন স্বীয় কক্ষ হইতে শুনিতে পাইলেন বাহিরে যেন একটা চাপা ক্রন্দন রোল উত্থিত হইয়াছে। ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীমতী রামরাখি সব বুঝিতে পারিলেন। এবার আর তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, সতীসাধ্বী সুস্থ নীরোগ দেহে স্বামীধ্যানে বসিয়া যেন স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া গেলেন; মাটিতে মিলাইবার জন্যই শুধু দেহখানি পড়িয়ারহিল। এরূপ স্বামীপ্রেম, এরূপ আত্মোৎসর্গের তুলনা কোথায়? ধন্য বালমুকুন্দ! ধন্য বালমুকুন্দের স্ত্রী!! হায়রে ভারতের অদৃষ্ট! এমন স্বামী এমন স্ত্রীও তোমার কপালে সইল না!!

(ক্রমশঃ)

সুখের ঘর গড়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(তারার কথা)

পর দিন বেলা আন্দাজ এগারোটার সময় ভবানীপ্রসাদ তাহার বৌদিদির নিকট বসিয়া তারামণির পিসির দুর্ঘটনার কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন ; বৃদ্ধার অবস্থা শুনিয়া নয়নতারা দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় ভবানীপ্রসাদ তারার মেয়ে সন্ধ্যার গুণের পরিচয় দিল। "সত্যি বউদি, ভাল বংশের মেয়ে যে তার ভুল নেই—"নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন "তাতে ভুল হবার আছে কি ? বাউনের ঘরের মেয়ে—তার ওপর বাপ ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোক, ভালরকম চাকরীই করতেন, আজ না হয় দুরবস্থায় পড়ে তোমার বাড়ী রাঁধুনীগিরি করছে তাতে কি আর বংশের গুণ উপে যাবে ?" ভবানী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"না তাই কি হয় ? আমি তাই-ই বলছি সাধারণ রাধুনীর ধরণ ধারণ লক্ষণ নয় —সত্যি বউদি ভারি চমৎকার মেয়েটি" নয়নতারা চাপা কৌতুকে দেবরের মুখের ভাব ও মনের প্রীতিমাখা প্রফুল্লতা দেখিয়া রহস্য করিয়া বলিল—"গুণেরই তো পরিচয় দিলে, আর অমন যে চমৎকাররূপ তা বুঝি চোখেই পড়ল না ?" এমন ভাবে টানিয়া হিঁচড়াইয়া ভবানীর মনোগত নীরব রূপ প্রশংসাটীকে বাহির করিয়া সুমুখে ধরাতে সে লজ্জিত হইয়া বলিল—হ্যাঁ দেখ্‌তেও বেশ —"

ন। বেশ্‌ তো বটেই ! যেন কত দয়া করে তারিপ করছ ; অথচ ঐটেই তোমার ভালকরে আগে প্রশংসা করা উচিত ছিল—

ভ। কথ্‌খনো না, ভদ্রলোকের মেয়ের রূপের প্রশংসা অপরিচিত পুরুষের মুখে শোনায়না ভাল—

ন। তার কারণ কি জান ? মানুষের রূপ জিনিষটাকে আমরা একটা মন্দ ভাবের সঙ্গে সংযোগ করে দেখি বলে নয় কি ? একটা বাসনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করে রাখার জন্যে এই ভয় সংকোচ ; গুণের মত রূপকেও যদি আমরা ভক্তির চোখে পবিত্রভাবে দেখ্‌তে শিখতাম তা হলে এ সংকোচ হতো না—জোর করে সমানে বলতে পারতাম্—বাঃ পুরুষটীর বা স্ত্রীলোকটির কি সুন্দর রূপ !" তা বল্‌তে পারলে নিজেদের মনের সরলতারই পরিচয় দিতে পারতাম,

রূপেরও ঠিক সম্মান করতে পারতাম। যাই বল আর যাই কর ভাই, আমাদের দেশের লোকেরা ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দানকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার ক'রে তার মর্য্যাদার ন্যায্য সম্মান দেখতে পারে না—

ভ। সত্যি বউ দি, ভোগের সঙ্গে দেহের রূপকে আমরা এমনি মিশিয়ে ছোট আর হীন করে দেখতে শিখিছি—

ন। সত্যি নয় কি ? আকাশের সন্ধ্যার রংবাহার বা ফুটন্ত গোলাপের বর্ণ মাধুরী দেখে আমরা কেমন সরল মনে বলে উঠি বা কি সুন্দর ! পারিনি শুধু মানুষের রূপের এম্‌নি ভাবে প্রশংসা করতে ! সে যাক্—

ভ। আচ্ছা বৌদি মেয়েটিতো বেশ বড়ই হয়েছে ; ওর মা না জানি তার বিয়ের ভাবনায় কতই অস্থির হয়েছেন—

ন। তা আর হয় না ? বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, তারপর গরীব—ভাবনার কি আর কুল কিনারা আছে ? টাকা অত পাবে কোথা ?

ভ। তা তো বটে সইত্যি বৌদি—

ন। তবে যদি কোনো বড়লোকের ছেলে মেয়েটির গুণ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিনিপণে তাকে বিয়ে করে ফেলে তার মাকে দায় উদ্ধার করে তবেই রক্ষে তা লক্ষণ দেখে মনে হচ্চে মেয়ের কপাল বা ফলে—

ভবানী হাসিয়া লজ্জানত মুখে বলিল—"বৌদি কিন্তু খুব যাহোগ, আমি যেন কথার ধাচ্‌ বুঝিনি—

নয়নতারা হাসিয়া বলিলেন "আমিও যেন মনের ভাব বুঝিনি"

ভ। একটি মেয়েকে ভাল বল্লেই বুঝি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে জানানো হয় ?

ন। হলেই বা দোষটা কি ? অবলঘর, ভালবংশ, রূপ গুণ দুই-ই আছে তবে বলতে পার রাধুনীর মেয়েকে জমীদারের ভাইপো হয়ে বিয়ে করতে পারে ?

ভ। আমি মানুষকে অত ঘেন্না করিনি। গরীব হওয়াটাই কি এত অপরাধ বৌদি ?

ন। তুমি না করতে পার,তোমার অভিভাবকরা করেন। সে যাগ তা হলে ঐটিকে রাণী করবার ইচ্ছে হয়েছে ?

ভ। বা ! বা ! তাই বুঝি বল্লাম আমি ?

ন। তা হলে মুখের প্রশংসা শুধু ?

ভ। এও তো মুস্কিল খুব! প্রশংসা করলেই বিয়ে করতে হবে? তা হলে তো কাকেও ভাল বলবার জো নাই—

ন। আর যাকে কোনো কালে দেখলাম না বুঝলাম না, কোনো পরিচয় পেলাম না তাকেই বিয়ে করতে হবে?—না হয় এটিকে বৌ করলে?

ভ। বলিছি তো বউদি বিয়ে আমি করবো না—

এমন সময় রান্না ঘরের দিকে মহেশ পত্নীর কর্কশ কণ্ঠ নিঃসৃত গর্জ্জন শোনা গেল, ভবানী বলিল, "কিদের অত চেঁচামেচি? পিসিমা কাকে বক্‌ছেন?"

নয়ন। হয়েছে; বুঝিছি—তুমি তারামণিকে বারণ করে এসেছিলে আস্‌তে, তাই হয়েছে রাগ 'কে রাঁধবে?' আমি বল্লাম "তাতে কি পিসিমা ওর বিপদ আন্‌, কি করে আস্‌বে? আমিই চালিয়ে দেবো কদিন—" তাতে কত কথাই শোনালেন; সন্ধ্যা বেলায় ঘর থেকে শুনলাম ঝিকে হুকুম করছেন, তার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিতে বলো সকালে। সেই বা এসেছে তাকেই বক্‌ছেন্ চলতো ব্যাপার কি দেখে আসি—'ঐ মেয়ে পারে এই হেঁসেলের ধাক্কা সাম্‌লাতে?', এই বলিয়া ভবানী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয়ে রান্না ঘরে ঢুকিয়া দেখেন—সত্যই সন্ধ্যা কাজে আসিয়াছে। জ্বলন্ত উনানে একটা প্রকাণ্ড ভাতের হাঁড়া, তার কানাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা ভয়ে, লজ্জায় ও তিরস্কারের নিষ্ঠুরতায় মর্ম্মাহত হইয়া দু হাতে দুটা ন্যাতা লইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; গৃহিণী কাদম্বিনী দেবী বর্ষার কালো মেঘের মত গর্জ্জন করিতেছেন ও গালি দিতেছেন—একধারে আহ্লাদীর মা বুড়া ঝি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বাটনা বাটিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে মনিবপত্নীর তিরস্কার বাক্যকে টীকা টিপ্পনীর দ্বারা বিশদ করিতেছে।

ভবানীকে দেখিয়া সন্ধ্যা সন্ধ্যারই মত হইয়া গেল; ভবানীর সম্মুখে তাহার অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় বাহির হইয়া পড়িবে আর ভবানীর সম্মুখে থাকিয়া তাহাকে এত নিন্দা ভর্ৎসনা লহ তরিতে হইবে, জানি না এ ভাবনাটা কেন সন্ধ্যাকে এত মলিন করিয়া দিল। অথচ আশ্চর্য্য এই তাহাকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে পরমুহূর্ত্তেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনুত্তরনীয় এই সংকটে যেন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইল।

দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তে দেবর ভাজ ব্যাপার খানা বুঝিয়া লইলেন। উভয়কে দেখিয়া কাদম্বিনী একটু সুর নরম করিয়া কিন্তু বাক্যের বিষ তেমনি মাত্রায় রাখিয়া বলিলেন "অত বড় ষোলো বছরের ধেড়ে মেয়ে একটা হাঁড়ি নামাতে

পারেন না—এমন নয় বাপু যে কখনো রাঁধিনি—বাড়ীতে তো পিণ্ড সেদ্ধ দুবেলা হয়—"

ভবানীর অসহ্য হইল সে বলিল "পিসিমা তুমি কি গো? একটু দয়া মায়া নেই? অই অত বড় হাঁড়ী বাগাতে পারে? শুধু শুধু গাল দিচ্ছ—"; নয়নতারা বলিল "বলিছিলামতো মা যে আমিই কদিন রাঁধ্‌বো, কেন মেয়েটাকে কষ্ট দেওয়া?"

কাদম্বিনী ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"করলে না কেন মা এসে? আসল কথা তা ত নয়—পেকারান্তরে বলা তুমি কি কচ্ছ বসে বসে? দুদিন রাঁধলেই পারতো—তা কি আর পারিনি বাছা! না পাল্লেই বা হবে কি করে? গতর না খাটালে ভাত দেবেই বা কে?—"

ন। আমি কি এই-ই বললাম পিসি মা? কেন অনর্থ কাণ্ড তুচ্ছ কথা নিয়ে বাধাও বলতো?

কা। আমিই তো বাধাই গো—আমার স্বভাবই যে তাই—না মা! আমার দেখছি এগুলেও আঁটকুড়ীর ঝি পেছুলেও তাই—দাসদাসী লোকজনকে কোনো কথাই যে আমার বলবার জো নেই—এতো জ্বালা কম নয়!

ভবানী কোনো কথায় যোগ না দিয়া আগাইয়া গিয়া সন্ধ্যার হাত হইতে ন্যাতা লইয়া আপনি সাবধানে কানা ভাঙ্গা হাঁড়ীটা নামাইয়া দিল। "বাবা! এই হাঁড়ী ওই কচিমেয়ে নামাতে পারে?—"

ন। আমি তোমাকে কখন গতর খাটাবার কথা বল্লাম পিসিমা? কেন মিথ্যে অপবাদ দিয়ে অশান্তি ঘটাও—লোকজনকে বলতে কে মানা করেছে? বলার ত একটা ধাঁচ ধরণ আছে?

কা। ধাঁচ ধরণ কি আমরা জানি মা? পাঁড়াগেয়ে ভুত আমরা—তোমার মত রাজার বৌ হতুম তো ধাঁচ ধরণ শিখতুম। কি কথা গো! বাউনি মাগী মিথ্যে ওজর করে বাড়ী বসে থাক্‌বে আর আমি কোনো কথাই বল্‌তে পাব না?—আঃ রে পোড়া পেটের ভাত!

নয়ন। (উত্তেজিত হইয়া) তুমি বলছ কি পিসিমা?

ভবানী। বাস্তবিকই ত পিসিমা কথাগুলো তোমরা কেমন সহজে এলোপাথাড়ী বলে যাও, কাকে কোথায় কতটা বাজে তা একবার ভাবনা—বাউন মেয়ে মিথ্যে ওজর করেনি, আমি সাক্ষী।

পি। ও বাবা তা হলে আর কথা আছে! আমার ঘাট হয়েছে বাবা, ঘাট হয়েছে, বৌ মা! লোকজন্‌কে আমার কিছুই বলা উচিত নয়—

ভ। কেন বলবে না?

পি। তার কারণ তারা আর আমি এক জাতের; গতর খাটিয়ে তারা ভাত মাইনে- পায় আমি শুধু ভাতই পাই! দোষ আমারই যে?—জমীদারের বউ আর বোন এই দুয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ—যতই দিন যাচ্ছে ততই বুঝছি—

'কি হয়েছে কাদু?' বলিয়া রতন রায় ঘরে ঢুকিলেন "এত চেঁচামেচি কিসের?" নয়নতারা ও ভবানী সরিয়া দাঁড়াইল, কাদু ভাইকে দেখিয়া একেবারে মুর্ত্তিমতী দীনতা হইয়া পড়িল। কাদু কাঁদুনে স্বরে বলিল 'চেচামেচি করি আমি; যার এবাড়ীতে জোর কম তার গলা বেশী বড় হবেই তো!

র। কি পাপ? সোজা কথা কি তোমরা কইতে পার না? যেমন বোনটী তেমনি বোনাই। সোজা সাদা কথায়—

কাদু। আমরাই তো হয়ে পড়িছি যত উৎপাতের।

র। বলি ব্যাপারটা কি তাই বল না? কি হয়েছে বৌ মা?

নয়নতারা যথাযথ যা ঘটিয়াছে তাহাই বলিলেন—শুনিয়া রতন রায় ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এই তো কথা? না?"—

কা। অমনি করে বল্লে অমনি দাঁড়ায়—বিশেষ উনি তোমার বউ; আর এ হ'ল ব্যাটার মত। আমি তোমার অন্নদাসী। যাগ্ দাদা যা হয়েছে তা হয়েছে পেটে খেলে পিঠে সয়—"

এই বলিয়া কাদম্বিনী চকিতের মত গৃহ ত্যাগ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়া সকলেই নির্ব্বাক রহিল। তারপর রতন রায় ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"দেখ বাবাজী; তুমি দেখ্‌ছি ক্রমশঃই অসহ্য করে তুল্‌ছো! সব বিষয়ে সব স্থানে সব কথাতেই দেখছি ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস্ খেতে আরম্ভ করেছ; বলি কেন বলতো? শুধু বাইরের সরকারী বে-সরকারী ব্যাপারেই নয় বাড়ীর ভিতর ও ঘরগেরস্থালীর ব্যাপারেও দেখে ন্যাকৃড়ার হদ্দ হয়ে উঠ্‌ছো তোমার যদি আমায় বেঁচে থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে কর্ত্তালি করবার সাধ হয়ে থাকে তা বলো আমিও আমার মনের ভাবটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দি?"

নয়নতারা দেবরকে এমনি ভাবে অকারণ তিরস্কৃত হইতে দেখিয়া তাহার হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন [illegible] তাঁকে বাধা দিয়া বলি-লেন—থাক বৌ মা—[illegible] বলাবলি—কিন্তু

আশা এখন তোমার স্থগিত রাখ্‌তে হবে পরমায়ু আমার আছে আমি গদী ছাড়ছিনি এ জেন, আর আমি আমার ইচ্ছে বুদ্ধিতেই চল্‌বো ও সবাইকে চালাবো আর তোমার মত চ্যাংড়ার কর্ত্তামি সহ্য করবো না—একটা কথা জান্‌তে চাই সে দিন ভোলা মাষ্টারের বাড়ীতে বাউন ভোজনের ব্যাপারে তুমি কেন গিয়েছিলে? এবং গিয়েইছিলে যদি কেন তুমি ওই বর্ব্বর ব্রাহ্মণের হয়ে চৌধুরীকে সভামধ্যে অপমান করেছিলে? উনি শুধু তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ নন, উনি তোমার পিসে, গুরুজন, আর উনি নিজের মত অনুসারেই যে এই ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তা নয়, নিশ্চয়ই এতে আমারও সম্মতি ছিল; আর না থাক্‌লেও উনি নিজে গ্রামের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি; নিজে সবদিক ভাল বুঝেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন, এক্ষেত্রে তোমার মাঝ হতে গায়ে পড়ে কর্ত্তামি করবার কি দরকার ছিল; তারপর একটা সামাজিক ব্যাপার, গ্রামের জমীদারের যতটা মীমাংসা করবার বা যথাযথ দেখবার অধিকার আছে ততটা তার একজন নগণ্য প্রজার নেই; এসব বুঝে সুঝেও তুমি কি জন্য বাড়ীর অপমানটা সভার মধ্যে নিয়ে এলে শুনি? মোদ্দা কথা, এদানীং দেখছি তুমি কিছু বেশী রকম মাতব্বর হয়ে উঠেছো।—কিন্তু আমি যদ্দিন বর্ত্তমান তদ্দিন তোমার এ সব মুরব্বী আনা কিছুতে সহ্য করতে পারবোনা; যখন তোমার আমল আস্‌বে তখন তুমি যা হয় করো এখন যেমন মানুষ তেমনি থাকবে যা বলি আমি। কাজ না থাকে, লেখাপড়ায় ইস্তফা দিতে হয় দাও কিন্তু সোজা কথা যা বুঝি. এখন তুমি না হয় অন্যত্র—"

নয়নতারা কথাটার ইঙ্গিৎ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি শ্বশুরকে হাত জোড় করত নিরস্ত করিয়া বলিলেন "বাবা আপনার পায়ে পড়ি, ও সব কিছু মনে করবেন না, ঠাকুর পো আপনার ছেলের মত, অবুঝ হয়ে যদি কিছু করে থাকে তার জন্যে—"

ভবানীও বৌদিদির কথার আঁচ বুঝিয়া বাধা দিয়া বলিল—'না বৌদি ওঁকে বল্‌তে দিন; কাকা বাবু যা আদেশ করছেন আমি তাইই করবো; সত্যই আমার এখানে থাকাই আর উচিৎ হচ্ছেনা—আমি আমার নিজের অবস্থা আর মূল্য বুঝতে পেরেছি—আমি আর কিছুতে থাকতে চাইনি যেমন ছিলাম—

রতনরায় বলিলেন—"হ্যাঁ কলকাতায় যেমন ছিলে তেমনি থাকগে মাসে মাসে খরচ পাঠাবো যা খুসি তাই করো—সোজা কথা যা বুঝি—যখন তোমার

সময় হবে এখানে এসে রাম রাজত্ব কর—" এইবলিয়া রতনরায় ক্রোধ সংযত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

নয়ন তারা দেবরকে বলিলেন—"ঠাকুর পো, রাগ করনা, রাগ করে একটা হটকারিতা দেখিও না কলকাতায় গিয়ে বাস করবে কেন শুনি?"

ভ। এখানে বাড়ীতে এমনি ভাবে থাকতে বলো বৌদি?

ন। বলি, একশোবার বলি—পিতৃতুল্য গুরুজন, অভিভাবক যদি দুটো কড়া কথা বলেন—

ভ। কড়া কথার জন্যে নয় বৌদি—বাপ মা খুড়ো জ্যাটা কড়া কথা বলবেনা তো বলবে কে?

ন। তবে?

ভ। আমি থাকতে চাইনি এই জন্যে যে এখানে থাকলে আমার মনুষ্যত্ব দিন দিন হীন হয়ে আস্‌বে। আমি চোখের উপর এই সব অত্যাচার অনাচার যার প্রতিকার করতে পারবো না তা সহ্য করতে পারবো না। নিজে যা ভাল বুঝবো তা যদি করতে না পারি তা হলে আমার শুধু খুড়োর অন্নদাস হয়ে পড়ে থাকা আমার মনে জ্ঞানে অন্যায় বলে বোধ হচ্চে। কাজ কি বৌদি এমন হয়ে হীন হয়ে জীবন ধারণ করা? খুড়োমশাই বা পিসে পিসি মনে করছেন আমি জমীদারীর লোভেই বুঝি লোকের কাছে প্রিয় হবার চেষ্টা করছি তার দরকার নাই; আমি গরীব গেরস্থর ছেলে, গরীবানা ভাবেই থাকতে চাই; কলকাতাতেই গিয়ে থাকবো, চাকরী একটা জুটিয়ে নিয়ে নিজের পেট চালাতে শিখ্‌বো—

বৌ। ছি ঠাকুরপো পাগলামি ছাড়— আর এক কথা আমি কি কেউ নই? আমার মায়া কাটাতে তুমি পার আমি কি করে তোমার মায়া কাটাবো?

ভ। পাগলামি আমার না তোমার বৌদি? আমি এই বাড়ী ছেড়েই যেতে চাই— তোমায় ছেড়ে তোমার মায়া কাটিয়ে যাব এ কথা কি ক'রে সিদ্ধান্ত করলে? আমি কি গ্রাম ত্যাগ করছি বৌদি? আমি যেখানেই যাই বা থাকি তোমার স্নেহ মমতা মায়া আমাকে সেইখান হতে টান্‌বে—ও কথা বলো না বৌদি আমার মা নেই তুমি আমার মা হয়ে মানুষ করেছ তা আমি ভুলিনি ভুলবোও না—যখন ডাকবে তখনই আস্‌বো, না ডাকলেও আস্‌বো সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব নইলে আমায় কে দেখ্‌বে?

বৌ। না না ও সব মতলব ছাড়—বিবেচনা হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছ—পিতৃতুল্য খুড়ো একটা কড়া বলেছে আর অমনি গৃহত্যাগ করতে বস্‌লে? তার

মনে কষ্ট হবে না? গুরুজনকে কষ্ট দিয়ে ভাল ফল হবে কি? এক কথায় এত রেগে যাও কেন? ভাই সংসার না জল-আগুন-কাঁটা ভরা অরণ্য, এখানে বাস করতে হলেই, জলে ভিজতে হবে, আগুনে পুড়তে হবে, কাঁটা বেধা সইতে হবে— এখনি এত অধৈর্য্য হচ্ছ? তবে মানুষ হয়ে ফুট্‌বে কি করে শুনি? পাঁচদিক হতে ঘা খাচ্ছ বলেইতো তোমার এক একটি গুণ ফুটে উঠ্‌ছে? যেখানে কোনো জ্বাল জঞ্জাল নেই সেখানে একা মুখ চোখ বুঝে পড়ে থাকাও যা আর মাটির মধ্যে মাটি চাপা পাথর হয়ে পড়ে থাকাও তা নয় কি?

ভবানী। বুঝি বৌদি কিন্তু—

ন। কিন্তু মিন্তু শুনছিনি—এখন যাও আবার কথা হবে—যা বললাম বুঝে দেখগে। ভাল কথা, হাঁড়ী নামালে হাত ধুলে না? ভুলে গেছ বুঝি?

ভবানী লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল "মনে ছিল না বৌদি একটু জল দাও।"

নয়নতারা সন্ধ্যাকে বলিলেন "দাওতো গা ঠাকুরপোর হাতে জল—"

সন্ধ্যা এতক্ষণ নীরবে দেবর ভাজের কথা শুনিতেছিল। আর মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া সভয়ে ভবানীকে সভক্তি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। নয়নতারার আদেশ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া জলের ঘটী লইয়া অগ্রসর হইল; ভবানী হাত পাতিয়া দিল, সন্ধ্যা লজ্জালাল মুখখানি নত করিয়া ভবানীর হাতে জল ঢালিতে গেল, কে জানে কেন হঠাৎ হাত কাঁপিয়া উঠায়—প্রয়োজন মাত্রাতিরিক্ত জল হাতে না পড়িয়া ভবানীর হরিণচর্ম্মের চটী দুটা ভিজাইয়া দিল। ভবানী হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বাঃ, বেশ জল দিলেতো?' সন্ধ্যা ভয়ে ও লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি নিজের অঞ্চল দিয়া চটী দুটা মুছাইয়া দিতে গেল; ভবানীও পায়ে হাত দেওয়া নিবারণ করিতে গিয়া সন্ধ্যার কচি দুখানি হাত ধরিয়া সরাইয়া দিল, "বলিল ছিঃ ছিঃ কি করছ? জুতো ভিজলোইবা!" একই মিনিটের মধ্যে এই ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল। লজ্জাবতী লতা যেমনি স্পর্শ মাত্রে কুঞ্চিত হইয়া যায়, ভবানীর কর স্পর্শে সন্ধ্যা তেমনি লজ্জা সংকুচিতা হইয়া হেঁসেলের দিকে চলিয়া গেল। নয়নতারা হাসিমাখা কৌতুক দৃষ্টিতে এই সুমধুর দৃশ্যটুকু উপভোগ করিতেছিলেন। দুজনেই বাহিরে আসিলেন। সন্ধ্যার হাত ধরিয়া বাধা দেবার পরমুহূর্ত্তেই ভবানীর মনে একটা খটকা লাগিয়া গিয়াছিল; ভাবিল বৌদিদি না জানি কি মনে করিলেন? বৌদির মন হইতে সেই ভাবটা সরাইয়া দিবার জন্য বলিল—'মেয়েটী কি ভীতু বৌদি?

জুতোটা কি না আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে এসেছে!—" বৌদি একটু হাসির রসান দিয়া বলিলেন—"তা না এলে কি এই পানিপীড়নটী হতো ভাই? এখন হাতটী যে ব্যাচায়ার উচ্ছিষ্ট করে দিলে আর তো ও দুটী হাতে আর কেউ হাত দেবেনা?"

ভ। (লজ্জিত হইয়া) যাও বৌদি কি বল যে তার ঠিক্ নেই—যদি কেউ শুন্‌তে পায় একথা—কি মনে করবে?

ন। মনে করবে গন্ধর্ব্ব মতে কন্যালাভ হচ্ছিল আর আমি বৌদিদি তার সাক্ষী বা পুরোহিত ছিলাম—

ভ। বিয়ে এত সস্তা নাকি বৌদি? যেখান হ'তে হোগ যাকে হোগ্ কুড়িয়ে এনে একটা বিয়ে করলেই হলো নাকি?

ন। এটা তোমার মনের কথা, না—আমার মন বোঝবার জন্যে তোমার মুখের কথা? যদি শেষটা হয় আমি কিছুই উত্তর দেবই না—

ভ। যদি মনের কথাই হয় বৌদি?

ন। তবে বলবো কি জান? তুমি মূর্খ, অন্ধ, অজ্ঞ, রত্ন চেন না—যদি চিন্‌তে তাহ'লে কাদা ধুলো মাখা একটী মণির কুঁচির জন্যে নিশ্চয়ই তুমি ছাই আস্তাকুড়, কাঁটাবোন, কিছুই বিচার করতে না—সকল কষ্ট ক্ষতি স্বীকার করে রাংতার খেয়াল ছেড়ে মণি টুকরাটীই জোগাড় করতে! আমার যদি তোমার বয়সী ছেলে থাক্‌তো আমি ঐ রত্নটী কুড়িয়ে ত দুরের কথা, ভিক্ষে করে এনে ছেলেকে দিতাম; ছেলে নেই তুমি আছ তার স্থান দখল করে, আমি ইচ্ছে করিছি ঐ রত্নকণাটী এনে তোমার কপালের টিপ করে দি?

ভ। না বৌদি আমার সেটা মনের কথা নয় সত্যি বলছি বৌদি—সে যাগ্ আচ্ছা ওটী যে কোহিনুরের টুক্‌রো তা কি করে জান্‌লে? পরিচয়টা কি ওই জুতো মুছিয়ে দেওয়াতেই পেলে?

ন। না ভাই সেদিন হাতে করে পুকুর পাড় হতে জুতো জোড়াটী; খাবার জলের কলসীর সঙ্গেই এক করে পৌছে দিয়েছিল ওই মেয়েটী নয়?

ভ। হ্যাঁ বৌদি।

ন। আরও পরিচয় চাও? একটী আমের একটুক্‌রো চাক্‌লেই বোঝা যায় কি জাতের আম? নয় কি?

ভ। হ্যাঁ বৌদি—কিন্তু সে যাগ্ রত্ন হোগ্। যদি আমার রত্নের লোভ না থাকে?

ন। আজ না থাক্, কাল হতে, পারে—দু বছর পরে হতে পারে?

ভ। আর যদি নাই-ই হয়?

ন। তুমি যে যিশুখৃষ্ট, চৈতন্য বা পরমহংস নও তা দিব্বি করে বল্‌তে পার?

ভ। না—না; এত আস্পর্দ্ধা রাখিনি।

ন। তবে চুপ কর।

ভ। না বৌদি ও সব মতলব করনা—তোমাকে জোড় হাত করে বলছি। আমার দিব্য রইল। আমার মানসিক অবস্থা ভাল নয়; পরে তোমায় বলবো এখন; বিয়ের অভাবে এখন রাজ্য বয়ে যাচ্ছে না।

ন। আচ্ছা কিন্তু তুমিও আমার অনুমতি ব্যতীত আর কোথায়ও যেন স্বয়ংবর হয়ে বা করে বসো না কেমন?

ভ। হ্যাঁ সে ভয় নেই।

ন! আমার একটু ঠাকুর ঘরে কাজ আছে যাই—

ভ। বৌদি একটা কথা, আমি যদি কলকাতায় চাকরী করে বাসা করি তুমি যাবেতো সেখানে? আমায় কে দেখবে?

ন। অনেক বারই ত বলেছি ভাই এ বাড়ী ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব কেন—আবার বুঝিয়ে বলবো—

ভ। আমাদের সাবেক মেটে বাড়ীতে যদি গিয়ে থাকি?

ন। পরে এসব কথা শুন্‌বো—

ভ। আচ্ছা।

এই বলিয়া দুজনে যে যার কাজে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

ডালি

গান্ধিজী

[শ্রীশ্রীনিবাশ শাস্ত্রী]

দৈনন্দিন জীবন হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। গান্ধীও এই অটুট সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। কেন না জীবনের অস্বাভাবিকতা বিদূরিত করিয়া উহাকে স্বভাব ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—যাহাতে জীবন সরল ও পবিত্র হইয়া উঠে। ঘটনা চক্রে কখন যা তাঁহার কার্য্য

কলাপ কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ; কখনও বা রাজশক্তির সম্মুখীন হইয়া তিনি শাসকের রোষাগ্নি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিতেছেন ; কখনও বা তাঁহার ভারতের স্বরাজের বাণী সমগ্র পৃথিবী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে আর সমস্ত জগৎ তাঁহার স্বরাজের স্বরূপ জানিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া আছে। তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য হইতেছে মনুষ্য জাতির আমূল আত্যন্তিক সংস্কার। 'স্বভাব ধর্ম্মে ফিরিয়া আইস্' ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র। তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘোর বিরোধী। তাঁহার স্বরাজ আন্দোলন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বৃহৎ সংগ্রামের অঙ্গমাত্র। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সেই বিশাল সংগ্রাম পরিচালিত হইবে সেই পদ্ধতিতেই স্বরাজ আন্দোলন চলিতেছে ; যে যে অস্ত্র শস্ত্র সেই বিশাল সংগ্রামে ব্যাবহৃত হইবে, তাহাই এই স্বরাজ সমরে ব্যবহৃত হইতেছে ; যে যে গুণরাজিতে ভূষিত হইলে কালক্রমে সেই বিশাল সংগ্রামে জয়ান্বিত হওয়া সম্ভব স্বরাজ সাধনায় ও সেই সেই গুণেই তিনি ভূষিত হইতে বলিতেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংগ্রাম ও স্বরাজ সাধনা উভয়েরই মূল সূত্র অহিংসা। অন্তরে ও বাহিরে নিরুপদ্রব হও। কায়-মনোবাক্যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট সাধন করিও না। তাঁহার নিকট ব্যক্তিগত ভাবে কেহই শত্রু নন। তোমার প্রতিপক্ষ এই আত্মিক বল মানিতে চায় না বলিয়া তোমাকে অনেক নির্য্যাতন ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। নির্য্যাতনেও ক্ষতি, হর্ষ প্রকাশ কর, সানন্দে উহাদিগকে বরণ করিয়া লও। যদি এই দুঃখ দৈন্য প্রফুল্ল বদনে বরণ করিতে না পার, দূরে সরিয়া দাঁড়াইও না বা কোন অভিযোগ আনিও না। শত্রুকে ভালবাস—যদি ভালবাসিতে পার ক্ষমা চাহিও কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করিও না। পশুশক্তি পরিহার্য্য সুতরাং উহা দমন করিয়া রাখিও। আত্মিক বল দুর্দ্ধর্ষ সুতরাং সেই অজেয় শক্তি অর্জ্জন কর। যাহাই ঘটুক না কেন সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইও না—সত্যের জয় অনিবার্য্য। এই মূল নীতি হইতেই স্বরাজ সংগ্রামের সফলতার জন্য অন্যান্য কয়েকটী বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বর্ত্তমান ব্রীটিশ শাসন যন্ত্রের হাত হইতে আমাদিকে মুক্ত হইতে হইবে সুতরাং এই উভয় শয়তান সন্তানের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক রাখিব না। যে সকল বিশালও শক্তিশালী অনুষ্ঠান আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিতে সহায়তা করিতেছে,তাহা হইতে সকল সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই হইল **বিদ্যালয়, আদালত** ও ব্যবস্থাপকসভা। বিদ্যালয় পরিত্যাগ কর, ন্যায় বিচারের

আশায় আদালতে নালিশ রুজু করিও না ; কখনও ভোট দিতে যাইও না। যন্ত্র সমূহ সয়তানের আবিষ্কার আর কলকারখানা ভারতে ব্রীটিশ প্রাধান্য স্থাপনের প্রধান অবলম্বন অতএব দুইই বর্জ্জন করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিও না, প্রতিগৃহে চরকার ব্যবস্থা কর। চরকার গতিতে নিগূঢ় শক্তি নিহিত রহিয়াছে—আত্মা পবিত্র হয়। এই চরকায় প্রস্তুত বস্ত্রই মনুষ্যদেহের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির।

গান্ধীর জীবনের লক্ষ্য বুঝিতে হইলে, যে সকল নিয়ম গঠন করিয়া তিনি আমেদাবাদ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠানের নাম সত্যাগ্রহাশ্রম। আশ্রমটি অদ্যাপি ক্ষুদ্র। ইহার প্রতিষ্ঠার পর হইতেই প্রতিষ্ঠাতার শক্তি নানা কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে সুতরাং ইহার জীবনীশক্তির পরিচয় দিবার অবসর আজ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যের সাফল্য দুইটি সর্ত্তের উপর নির্ভর করিতেছে, প্রথমতঃ সংখ্যাবৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ তাহার অল্পসংখ্যক ভক্তবৃন্দ যে কঠোর আদর্শে জীবনযাপন করিতেছে সে আদর্শ সাধারণের বিনা আপত্তিতে গ্রহণ। ভবিষ্যতে ইহার প্রভাব কি পরিমাণে হইবে অনুমান করিবার পূর্ব্বে তাহার নূতন গীতার সত্য প্রকৃতি বিশদ ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। নির্ম্মল সত্য সেইখানেই কেবল বিরাজ করে, যেখানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। সকল প্রকার বল-প্রয়োগ ও বাধ্যকরণ সে হেতু বর্জ্জনীয়। অন্তরে অন্তরে যে বিদ্রোহী তাহার নিকট বাধ্যবাধকতা, প্রভুত্বও শাসন উন্নতির অন্তরায়। তিনি কখনও বলেন তাহার ধর্ম্মের সার প্রেম। কখনও বলেন সত্য, কখনও বলেন অহিংসা। তাঁহার নিকট ইহার সকলেরই এক অর্থ। আদর্শজগতে কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনই সমর্থন যোগ্য নহে। বৃটিশ শাসনের গুণ এই যে, ইহাতে ব্যক্তিগত —স্বাধীনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এমন কি পরিবারে ও বিদ্যালয়ে স্নেহ ও নৈতিক যুক্তির বলের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিবে। উৎকট অশিষ্ট অপরাধের স্খালন কল্পে তিনি নিজে শাস্তি গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য উপবাস করেন। প্রতিবারেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দোষীপক্ষ অনুতপ্ত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলে ভীষণ ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার জন্য তিনি এই উপায় অবলম্বন করেন—পাপের ভয়ে কলের কর্ত্তারা যুক্ত সঙ্গত সর্ত্ত মানিয়া লয়েন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাজ কুমারের আগমন প্রাক্কালে বোম্বাই নগরে অসহযোগের নামে কয়েকজন ব্যক্তি বল প্রয়োগ করায় তিনি

আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত এই উপবাস গ্রহণ করেন—ইহার ফলও সর্ব্বতোভাবে আশানুরূপ হইয়াছিল। এই আন্দোলনে যতটা অত্যাবশ্যক তাহার অধিক কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অভাবের অধিক গ্রহণ করা চৌর্য্য অপরাধের তুল্য। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন। অনেক বৎসর বিচক্ষণতার সহিত তিনি আইন ব্যবসা করিয়াছিলেন—কিন্তু আজ কয়েকখানি পরিধেয় বস্ত্র এবং ঐ শাল ধারণের জন্য একটি থলিয়াই তাহাদের সর্ব্বস্ব। আমেদাবাদ আশ্রমে কেবল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী রহিয়াছে।

আপনার পরিশ্রমের দ্বারা প্রত্যেকে আপনার অভাব মোচন করিবে। যে শস্য তুমি ভক্ষণ কর, নিজের হাতে উৎপাদন করিবে, যে বস্ত্র পরিধান কর স্বহস্তে বয়ন করিবে ইহাই তাহার আদর্শ। যাঁহারা মস্তিষ্কের পরিশ্রম করেন, তাঁহারাও এই দৈহিক পরিশ্রম হইতে রেহাই পাইবেন না। বাস্তাবিকই তিনি চরকার উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ইহার সঙ্গীতে মুগ্ধ। ছাত্রগণ পুস্তক ফেলিয়া চরকা চালাক; আইন-ব্যবসায়ীজীবগণ মামলা ফেলিয়া চরকা গ্রহণ করুক, চিকিৎসকগণ রোগপরীক্ষার যন্ত্র ফেলিয়া চরকা ঘুরাক। অত্যাবধি চরকার প্রস্তুত বস্ত্র বড় মোটা—কিন্তু তিনি বলেন স্ত্রী কি পুরুষকে স্বহস্ত-প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করিলে যেরূপ দেখায়, অন্য কিছুতে সেরূপ দেখায় কি? তাঁহার একটি ছাত্রী স্বহস্ত প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইলে, তিনি বলিলেন যে তাহাকে দেবীর ন্যায় দেখাইতেছে। তাঁহার চক্ষে তিনি ঐরূপই দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনে ঐ রূপই বোধ হইয়াছিল—সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সংযম। ইহা বড় কঠিন ও সময়সাপেক্ষ—কিন্তু ইহা নিরবচ্ছিন্ন নিয়মভাবে পালন করিতে হইবে। ভোগবিলাস সর্ব্বদা পরিহর্ত্তব্য। ভোগকে দিন দিন কমাইয়া আনিতে হইবে। রসনাকে দৃঢ়রূপে সংযত করিতে হইবে। সামান্য আহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আশ্রমবাসীদিগকে চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে বলেন। দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিহার করিয়া ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে স্বীকৃত হইলে বিবাহিত দম্পতিকেও আশ্রমে গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত আছে বলিয়াই তিনি কল-কারখানা বর্জ্জন করিতে বলেন। এগুলি সয়তানের রাজ্যের। কলকারখানায় শ্রমজীবীর মনুষ্যত্ব হানি হয় সুতরাং তাঁহার রাজ্যে উহাদের স্থান নাই। তিনি ডাকঘর তাড়িৎবার্ত্তা ও রেলপথের নিন্দা করেন ইহার সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্র উঠাইয়া

দিবারও পক্ষপাতী। যখনই তিনি উহাদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হন, মনে বড় ব্যথা পান। দ্রুতগামী ও সহজগম্য গমনাগমনের উপায়গুলি কেবল অপরাধ ও রোগের বৃদ্ধি করিতেছে। ভগবান মানুষকে পা দিয়াছেন এই অভিপ্রায়ে যে যতদূর পদব্রজে গমন করা সম্ভব তাহার অধিক পথ তাহারা না যায়। সাধারনতঃ যাহাকে রেলপথের উপকারিতা বলা হয়, তিনি তাহাকে অপকারিতা বলেন যেহেতু এতদ্দ্বারা আমাদের ভোগ বৃদ্ধিহইযাছে এবং ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হইতেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রও তাঁহার কঠোর সমালোচনা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। তিনি বলেন ঔষধ সেবন করিয়া বাঁচা অপেক্ষা মরণ অধিক শ্রেয়! মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ সেদিন হইবে, যেদিন প্রকৃতির ব্যবস্থার উপর সে নির্ভর করিবে এবং জীবনকে সহজ ও সরল করিয়া তুলিবে।

সাধারণ ব্যক্তির নিকট এই সমুদয় উপদেশ বিকট ঠেকিবে সন্দেহ নাই কিন্তু মহাত্মার নীতিশাস্ত্রের ইহাই সারাংশ। মনে করিবেন না তিনি এইসকল নৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়া বা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, তিনি প্রাত্যাহিক জীবনে অক্ষরে অক্ষরে উহা পালন করেন। তাহার পার্থিববস্তুর ত্যাগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পীড়িত হইলে তিনি চিকিৎসক ডাকেন না। তিনি সুখাদ্য গ্রহণ করেন না। স্বহস্ত-প্রস্তুত খদ্দর পরিধান করেন এবং এই পরিচ্ছদে নগ্নপদে এমন কি ভারতলাটের নিকট উপস্থিত হন। তিনি লোক-ভয়ে ভীত নন অপরকে যাহা করিতে আদেশ করেন তাহাহইতে কখনও পশ্চাৎপদ হন না। দুঃখ কষ্ট তাঁহার বড় প্রিয় যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস দুঃখ কষ্ট দ্বারাই আত্মিক উন্নতি সম্ভবিত হয়। তাঁহার হৃদয় সমবেদনা ও কোমলতায় সমুদ্রের ন্যায় অসীম। একদিন তাঁহাকে স্বীয় বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া কুষ্ঠরোগীর ক্ষতস্থান ধৌত করিতে দেখিয়াছিলাম। ফলতঃ তিনি ইন্দ্রিয় পূর্ণমাত্রায় সংযত করিতে ও আত্মজীবনে সন্ন্যাসীর কঠোর আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ জনসাধারণের উপর এতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন এবং আপনাকে মহাত্মা আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি জাতি প্রথার সমর্থন করেন কিন্তু কখনও জাতির অহঙ্কারের অনুমোদন করেন না তিনি মনে করেন পূর্ব্বের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলে জাতিপ্রচার উপকারিতা আছে এবং এই বর্ণাশ্রমই হিন্দুধর্ম্মের মেরুমজ্জা। কিন্তু তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করিতে চাহেন। তিনি তথাকথিত নিম্নজাতির উন্নতি করিতে

চান। তিনি বলেন যে সকল কর্ম্মী এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহাদের একস্তরে নামিয়া আসিয়া উঁহাদেরই ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। এই রূপেই যথার্থ সমবেদনা ও সহানুভূতি জাগিবে ও পতিতজাতির আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদের উন্নতি সম্ভবপর হইবে। তাহার অনুচরবর্গ জনসেবা ব্রতের সহিত রাজনীতি মিশাইয়া ফেলেন সেইজন্য অনেক সময় তাহাদিগকে কাজে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়। তাঁহার মত রাজনীতিক স্বাধীনতা জনসঙ্ঘের নিকট কিছুমাত্র প্রয়োজনে আইসে না সামাজিক দুর্নীতি যতদিন না দূর হয়। যুগপৎ সামাজিক সংস্কার না হইলে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

মহাত্মার শিক্ষার আদর্শ কি তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই। তবে সুন্দর সুন্দর ঐতিহাসিক গবেষণা অর্থনীতিক আবিষ্কার, কলকারখানাও নানা ভাবে ঋদ্ধি বৃদ্ধির উপায় তাঁহার ব্যবস্থায় স্থান পায় নাই! তিনি সমগ্র ভারতে এক ভাষা প্রচলন করিতে চান—তাঁহার মতে হিন্দিই সমস্ত ভারতের ভাষা হইবার উপযুক্ত।

আমি তাঁহার শিক্ষা সহানুভূতি পূর্ণচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছি। তাঁহার মহানচরিত্র—হৃদয়শুদ্ধির ক্ষমতা আমি অনুভব করিয়াছি। তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হৃদয়ে বল পাইয়াছি। এই জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা জাগিয়াছে। আর সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয়কন্দরে যে সম্পৎ বিরাজ করিতেছে তাহার ক্ষীণআভা পর্য্যালোকন করিয়াছি আর সম্ভ্রমে দেখিয়াছি—তাঁহার মহিমা মণ্ডিত জীবনের কত না সন্তাপ ও সংগ্রাম।

["Gandhi the man" প্রবন্ধের অনুবাদ]

"চন্দ্রগুপ্তে"র গান।*

(তৃতীয় গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ইমন্——একতালা।

সৈনিকগণ।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা ;
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা ;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আনন খানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি' ধরণী মুগ্ধ-নয়নে চাহে ;
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটী ভাসে হৃদয়ে, তাহারই মুরলী বাজে ;
উজ্জল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলনমধুর হাসি ;
শুনিব বিরহনীরব কণ্ঠে মিলনমুখর বাণী,—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

	০				১				২´				৩			
II {	না	ধা	ধা	।	না	পা	পা	I	ক্ষা	পা	পা	।	ক্ষা	গা	গা	।
	য	খ	ন		স	ঘ	ন		গ	গ	ন		গ	র	জে	

---

* "চন্দ্রগুপ্তে"র গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে 'নারায়ণে'র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

০ ১ ২´ ৩
। গা পা পা । ক্ষা গা রা I ক্ষা -পা -ধা । না -া -া } ।
ব রি ষে ক র কা ধা ॰ ॰ রা ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। { পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা ।
স ভ য়ে অ ব নী আ ব রে ন য় ন

০ ১ ২´ ৩
। সা -রা গা । গা -া গরা I ক্ষা -পা -ধা । না -া -া } ।
লু প্ ত চ ন্ দ্র॰ তা ॰ ॰ রা ॰ ॰ } ।

০ ১ ২´ ৩
। { পা -ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা ।
দী প্ ত ক রি সে তি মি র জা ॰ গে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্রা র্রা । র্সর্রা র্গা র্গা I র্রা -সা -না । ধা -পা -া ।
কা হা র আ॰ ন ন থা ॰ ॰ নি ॰ ॰

। ধুয়া } II ।

০ ১ ২´ ৩
II { গ গা -া রা । পা পা পা I পা -া পা । পা পা পক্ষা ।
জ্যোৎ স্ না হ সি ত নী ॰ ল আ কা শে॰

০ ১ ২´ ৩
। গা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
য খ ন বি হ গ॰ গা ॰ ॰ হে ॰ ই॰

০ ১ ২´ ৩
। স সা -গা গা । রা সা সন্া I ধ্া ন্া ধ্া । ন্া সা সা ।
স্নি গ্ ধ স মী রে॰ শি হ রি ধ র ণী

০ ১ ২´ ৩
। সা -গা গা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
মু গ্ ধ ন য় নে॰ চা ॰ ॰ হে ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
{ গা গা -পা । প পা পা পা I না ধা না । পা -ক্ষা -গা ।
ক্ষ ণ ন্ স্ম র ণে বা জে কা হা ॰ র্

০ ১ ২´ ৩
। ররা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
মৃ দু ল ম ধু র॰ বা ॰ ॰ ণী ॰ ॰

। ধুয়া } II

০ ১ ২´ ৩
II { পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা । র্সা -া র্সা ।
আঁ ধা রে আ লো কে কা ন নে কু ঞ্ জে

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্রা র্রা । র্সর্রা র্গা র্গা I র্রা -র্সা -না । ধা -পা -া
নি খি ল ভু॰ ব ন না মা ॰ ঝে ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। পা ধা পর্সা । র্সা র্সা র্সা I না ধা ননা । পা -ক্ষা গা ।
তা হা রেই হা সি টী ভা সে হৃ দ ॰ য়ে

০ ১ ২´ ৩
। রা গা রগা । পা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
তা হা রই মু র লী॰ বা ॰ ॰ জে ॰ ॰

০ ১ ২ ৩
। { সা গা রা । সা সা ন্া I ধ্া ন্া ধ্া । ন্সা সা -া ।
উ জ্ জ ল ক রি য়া আ ছে দু রে॰ সে ই

০ ১ ২´ ৩
। সা গা গা । পা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
আ মা র কু টী র॰ খা ॰ ॰ নি ॰ ॰

। ধুয়া } II

০ ১ ২´ ৩
II { গা গা গা । রা পা পা I পা পা পা । পা পা -ক্ষা ।
ব হু দি ন প রে হ ই ব আ বা র্

০ ১ ২´ ৩
। সা গা রা । গা পা পক্ষা I গা -া -রা । সা -া -া ।
আ প ন কু টী র॰ বা ॰ ॰ সী ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। সা গা গা । রা সা সন্া I ধ্া ন্া ধ্া । ন্া সা সা ।
দে খি ব বি র হ॰ বি ধু র অ ধ রে

০ ১ ২´ ৩
। সা গা -া । গা পা পহ্মা I গা -া -রা । সা -া -া } ।
মি ল ন্ ম ধু র০ হা ০ ০ সি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। { গা গা পা । পা পা পা I না ধা না । পা -হ্মা গা ।
শু নি ব বি র হ নী র ব ক ন্ ঠে

০ ১ ২´ ৩
। রা গা রা । গা পা পহ্মা I গা -া -রা । সা -া -া ।
মি ল ন মু খ র০ বা ০ ০ ণী ০ ০

ধুয়া :—

০ ১ ২´ ৩
। পা ধা -পা । র্সা র্সা র্সা I পা -ধা -না । ধা -পা -া ।
আ মা র্ কু টী র রা ০ ০ ণী ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। সা রা গা । হ্মা পা -া I ন় না় না ধা । প় হ্মা় গা -া } IIII
সে যে গো আ মা র্ হৃ দ য় রা০ ণী ০

দ্রষ্টব্য।—যে যে জায়গায় 'ধুয়া'—বলে লেখা আছে, সে সে স্থানে উল্লিখিত সুরে ও তালে 'ধুয়া' গেয়। বলা বাহুল্য যে এ গানখানি বহুল প্রচলিত গান; তাই মত্ বিশেষে গানটি একটু পরিবর্ত্তিত সুরেও গীত হ'য়ে থাকে, এবং পংক্তি বিশেষ বাদ্‌ও দেওয়া হয়। যাই হ'ক্। এখানে কিন্তু অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গাওয়া হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হ'ল।——লেখিকা।

শোক সংবাদ—চট্টলের প্রিয়কবি বঙ্গকাব্যকুঞ্জের একজন কলকণ্ঠপিক কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তাঁহার প্রতিভা-রবি মধ্যগগনে উপনীত হইয়াই অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। জীবেন্দ্রকুমার আমাদের নারায়ণের একজন নিয়মিত লেখক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহার অভাব নারায়ণের বুকে বড়ই বাজিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার স্বর্গগত আত্মা শান্তিলাভ করুক। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

ভ্রম সংশোধন—গতবারের পঞ্চপ্রদীপে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের 'বীরভাবের কথা'র নিম্নে ভ্রমক্রমে প্রবর্ত্তকের নাম ছাপা হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত।

দ্রষ্টব্য—নারায়ণের আষাঢ়িক সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ মাসে বাহির হইবে

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] শ্রাবণ, ১৩২৯

দেশের অবস্থা

[শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পাঞ্জাব অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পূর্ব্বে একদিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশ-জোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয় জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিগে প্রচার করে বলেছিলাম স্বরাজ চাইই চাই। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোনদিন প্রতিবিধান করতে পারব না। কথাটা যে মূলতঃ সত্য, এ বোধ করি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবর্ষীদের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে কেউ তাদের বঞ্চিত রাখে, সেই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একটা কথা আছে, যাকে স্বীকার না কোরে পথ নাই,—সে হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। Right এবং Duty এই দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারে না, এতো অবিসম্বাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্ব নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতায় যদি আমাদের জন্ম-স্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্ত্তব্যের দায়ী হয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ